POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর, রাত্রি (আগমণ) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।

(আল বাকারা: ১৮৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 20

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 19 মে, 2022 17 শওয়াল 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

রমযানে পরিত্যক্ত রোযা

ওয়াহাব বিন আব্দুল্লাহ্ সোয়াঈর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) হযরত সালমান এবং হযরত আবু দারদা (রা.)র মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। হযরত সালমান হযরত আবু দারদার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়ে তিনি হযরত উম্মে দারদাকে মলিন বস্ত্র পরিহিতা অবস্থায় দেখেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার এই অবস্থা কেন? তিনি বলেন, তোমার ভাই আবু দারদার কোনও জাগতিক চাহিদা নেই। ইতিমধ্যে হযরত আবু দারদা এসে পড়েন। তিনি হযরত সালমান (রা.)-এর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে তা গ্রহণ করতে বলেন এবং আমি রোযা রেখেছি। হযরত সালমান (রা.) বলেন: আমি ততক্ষণ খাব না যতক্ষণ আপনি না খান। (ওয়াহাব বলেন) হযরত আবু দারদা খাবার খেলেন আর যখন রাত্রি হল তখন তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। (হযরত সালমান বললেন,) আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। একথা শুনে তিনি শুয়ে পড়লেন। এরপর পুনরায় তিনি নামাযের জন্য উঠতে গেলে হযরত সালমান তাঁকে বললেন, এখন ঘুমান। রাত্রির শেষ পহরে হযরত সালমান বললেন, এখন উঠে দুটি নামাযই পড়ে নিন। হযরত সালমান (রা.) তাঁকে বললেন, তোমার রব-এর তোমার উপর অধিকার আছে আবার তোমার প্রাণেরও তোমার উপর অধিকার আছে এবং তোমার স্ত্রীরও তোমার উপর অধিকার আছে। তাই তাই প্রত্যেক প্রাপককে তার প্রাপ্য অধিকার দাও। হযরত আবু দারদা নবী (সা.)-এর কাছে একথার উল্লেখ করলে নবী (সা.) বললেন, সালমান সত্য বলেছে।

(সহী বুখারী, কিতাবুস সওউম)

সেই ব্যক্তি নির্বোধ যে নিজের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা অথবা নিজের ধন সম্পদ নিয়ে গর্ব করে। কেননা এই সব কিছুই তো আল্লাহ্ তা'লার দান। এসব কিছু সে কোথা থেকে এনেছে?

আর দোয়ার জন্য জরুরী হল মানুষ যেন দুর্বলতার বিষয়ে সচেতন থাকে এবং সে কথা স্মরণ রাখে। মানুষ নিজের দুর্বলতা নিয়ে যতই চিন্তা করবে, সে ততই নিজেকে খোদা তা'লার সাহায্যের মুখাপেক্ষী হিসেবে গণ্য করবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

একথা সত্য যে خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا (সূরা নিসা: ২৯) মানুষ দুর্বল প্রাণী, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে সে কিছুই করতে পারে না। তার অস্তিত্ব, প্রতিপালন এবং টিকে থাকার উপকরণসমূহ- এই সব কিছুই আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উপর নির্ভরশীল। সেই ব্যক্তি নির্বোধ যে নিজের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা অথবা নিজের ধন সম্পদ নিয়ে গর্ব করে। কেননা এই সব কিছুই তো আল্লাহ্ তা'লার দান। এসব কিছু সে কোথা থেকে এনেছে? আর দোয়ার জন্য জরুরী হল মানুষ যেন দুর্বলতার বিষয়ে সচেতন থাকে এবং সে কথা স্মরণ রাখে। মানুষ নিজের দুর্বলতা নিয়ে যতই চিন্তা করবে, সে ততই নিজেকে খোদা তা'লার সাহায্যের মুখাপেক্ষী হিসেবে গণ্য করবে। আর এভাবে সে দোয়ার জন্য তার মধ্যে এক উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। যেমন, মানুষ যখন বিপদে পড়ে, দুঃখ-কষ্ট এবং অভাব অনটন অনুভব করে, তখন সে অনেক শক্তি দিয়ে খোদাকে ডাকে, চিৎকার করে এবং অপরের সাহায্য প্রার্থনা করে। অনুরূপভাবে সে যদি তার নিজের দুর্বলতা এবং অবাধ্যতার বিষয়ে ভেবে দেখে আর নিজেকে সর্বক্ষণ খোদা তা'লার সাহায্যের মুখাপেক্ষী পায়, তখন তার আত্মা পূর্ণ উদ্যমে এবং বেদনাপ্লুত হয়ে খোদার দরবারে নতজানু হয় এবং ক্রন্দন করে আর হে রব হে রব বলে খোদাকে ডাকতে থাকে। প্রণিধানসহকারে কুরআন করীমকে দেখ। বুঝতে পারবে যে, প্রথম সূরাহেই আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শিখিয়েছেন।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ (الفاتحة:6،7)

দোয়া তখনই পরিপূর্ণ হতে পারে যখন তা নিজের মধ্যে যাবতীয় কল্যাণ ও উপযোগিতা পরিবেষ্টিত রাখে এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। কাজেই এই দোয়ার মধ্যে সম্ভাব্য সকল উৎকৃষ্ট কল্যাণ যাচনা করা হয়েছে এবং মানুষকে ধ্বংস করে দেয় এমন বড় বড় ক্ষতিক্ষর বিষয় থেকে রক্ষা করার দোয়া রয়েছে।

আমি বার বার বলেছি, পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা চার প্রকারের। প্রথম- নবী, দ্বিতীয়-সিদ্দীক, তৃতীয়-শহীদ এবং চতুর্থ সালেহ। অতএব, এই দোয়ায় এই চার শ্রেণীর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব যাচনা করা হয়েছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭২)

কুরআন করীম ছাড়া কোন শিক্ষা পৃথিবীর মতানৈক্য দূর করতে পারে? জগতবাসী যদি জানতে পারে যে এই বাণী খোদার পক্ষ থেকে এসেছে,তাহলে তারা নিজেদের চিন্তাধারা ত্যাগ করবে।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا
لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى
وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহলের ৬৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

ঐশী বাণী অবতীর্ণ হওয়ার আরও একটি প্রয়োজনীয়তা হল পৃথিবীতে মানুষের মাঝে নৈতিক এবং ধর্মীয় বিষয়ে চরম বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। খোদার পক্ষ থেকে এক নিশ্চিত জ্ঞান লাভ না হলে এই বৈষম্য কিভাবে দূর হতে পারে? অতএব, এই শিক্ষা ও জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যেই এই কিতাব নাযেল হয়েছে। এটি ছাড়া আর কোন শিক্ষা পৃথিবীতে বিরাজমান মতানৈক্য দূর করতে পারে? জগতবাসী যদি জানতে পারে যে এই বাণী খোদার পক্ষ থেকে এসেছে,তাহলে তারা নিজেদের চিন্তাধারা ত্যাগ করবে। নচেত কিভাবে নিজেদের চিন্তাধারা ত্যাগ করতে পারত? কেননা প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের চিন্তাধারাকে অপরের চিন্তাধারার উপর প্রাধান্য দেয়। এই আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা পূর্ববর্তী নবীদের পর অন্য কোনও নবীর আগমণ নিয়ে আপত্তি কর। অন্য কোনও নবী তোমাদের কর্মের কারণেই এসেছে, তোমরা সত্য ত্যাগ করে মত বৈষম্য কেন সৃষ্টি করেছ? তোমরা যদি মতানৈক্য না করতে তাহলে নিঃসন্দেহে কোনও নবীর প্রয়োজন হত না। কিন্তু তোমরা ব্যধি সৃষ্টি করে এখন বলছ, খোদা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের প্রয়োজন নেই, যে তোমাদের মধ্যেকার এই মতানৈক্য দূর করবে।

এরপর ৭এর পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মহানবী (সা.)-এর তবলীগ

পুণঃপ্রকাশিত

পূর্ববর্তী সংখ্যার পর....

হযরত যুবের বিন আল আওয়াম (রা.) মহানবী (সা.)-এর পিসতুতো ভাই ছিলেন। এবং হযরত তালহা (রা.) বিন উবাইদুল্লাহ্ও স্বল্প বয়সে ইসলামের আলিঙ্গানে আবদ্ধ হন। দুই তিন বছরে দোয়া এবং তবলীগের পরিশ্রমের ফলে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা নগণ্যই ছিল। হযরত আবু উবাইদুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাররাহ (রা.) হযরত উবাইদা বিন হারিস (রা.), হযরত আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ, হযরত আবু হুযাইফা (রা.) বিন উতবা, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, হযরত উসমান বিন মাযুয়ী, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাহাম, হযরত ওবাইদুল্লাহ (রা.) বিন জাহাশ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.), হযরত বিলাল (রা.) বিন রাবাহ, হযরত আমের (রা.) বিন ফুহেরা, হযরত খাব্বাব বিন আল আরিস, হযরত আবু যার গাফফারি (রা.) হযরত আসমা বিনতে আবু বাকার (রা.) , হযরত ফাতিমা বিনতে খাততাব, আব্বাস বিন আব্দুল মুতালেবের স্ত্রী হযরত উম্মে ফযল (রা.)- এই কয়েকজন বালক ও যুবক ছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বা যারা দরিদ্র, দুর্বল ও বৃদ্ধ ছিলেন। যাদেরকে নিজেদের পরিবার বা গোত্রের মধ্যে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হত না যে তাদের ইসলাম গ্রহণের ফলে অন্যরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

সংখ্যায় নগণ্য হওয়ার কারণে এঁরা নিজেদেরকে প্রকাশ করতেন না। অনেক সময় মুসলমানেরা একে অপরের সঙ্গে মিলিতও হত কিন্তু তাঁরা নিজেদের মুসলমান হওয়ার পরিচয় গোপনই রাখতেন। এমনই সব দুর্বল, দরিদ্র ও বাহ্যতঃ অসহায় মানুষদের নিয়েই ইসলামের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু ঐ সকল দূর্বল মানুষদের সঙ্গে খোদা তা'লার শক্তি ছিল, তিনি বিরোধী কুফফারদের মধ্য থেকে বেছে বেছে এমন মানুষদেরকে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছিল যাতে ইসলামে শক্তি বৃদ্ধি পায়। এখন মক্কার একজন বীরযোদ্ধার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা শুনুন।

হযরত ওমর (রা.) ইসলামের ঘোর শত্রুদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি যে কোন প্রকারে এই নতুন ধর্মের প্রসার বন্ধ করতে চাইছিলেন।

" একদিন তাঁর মনে এই ধারণার উদয় হল যে, এই ধর্মের প্রবর্তককে খতম করলেই তো যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এই চিন্তা করে তিনি তরবারি হাতে নিয়ে হযরত রসুলুল্লাহ (সা.)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বার হলেন। পথিমধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, ওমর তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি উত্তর দিলেন আমি মহম্মদ (সা.) হত্যা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি হেসে বলল: নিজের ঘরের সংবাদ নাও। তোমার বোন ও ভগ্নীপতি তাঁর উপর ঈমান এনেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন: মিথ্যা কথা। সেই ব্যক্তি বলল, তুমি নিজে গিয়ে দেখে নাও।

হযরত ওমর (রা.) যখন সেখানে গেলেন ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। ভিতরে একজন সাহাবি (রা.) কুরআন মজীদ পড়াচ্ছিলেন। তিনি (রা.) দরজার কড়া নাড়লেন। তাঁর ভগ্নীপতি জিজ্ঞাসা করলেন- কে? হযরত ওমর (রা.) উত্তর দিলেন: ওমর। তারা যখন দেখলেন যে, ওমর এসেছেন, তখন তারা সেই সাহাবী যিনি কুরআন করীম পড়াচ্ছিলেন তাঁকে এবং কুরআন মজীদের পৃষ্ঠাগুলি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে দিলেন এবং তারপর ঘরের দরজা খুললেন। কেননা তারা জানত যে, হযরত ওমর (রা.) ইসলামের ঘোর বিরোধী। হযরত উমর যেহেতু একথা শুনে এসেছিলেন যে, তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছে, তাই তিনি আসা মাত্রই জিজ্ঞাসা করলেন যে দরজা খুলতে এত দেরী হল কেন?

তাঁর ভগ্নীপতি উত্তর দিলেন: এমনিই দেরী হল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, একথাটি সত্য নয়, অন্য কোন কারণ দরজা খুলতে বাধা সৃষ্টি করেছে। আমি শুনেছি, তোমরা সেই সাবীর(মুশরিকরা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লেল্লাহু ওয়া আলেইহে ওয়া সাল্লামকে সাবী বলত) কথা শুনছিলে। তারা বিষয়টি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু এতে হযরত ওমর (রা.) ক্ষুব্ধ হলেন, তিনি (রা.) তাঁর ভগ্নীপতিকে মারতে উদ্যত হলেন। তাঁর বোন স্বামীর ভালবাসার কারণেই তাদের দুজনের মাঝে এসে দাঁড়াল। হযরত ওমর হাত তুলে ফেলেছিলেন, আর তাঁর বোন সহসা মাঝে এসে পড়ায় তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি। তাঁর হাত সজোরে বোনের নাকে এসে আঘাত করে যার ফলে নাক থেকে রক্ত ঝরে পড়ে। হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। একথা চিন্তা করে যে, তিনি একজন মহিলার উপর হাত উঠিয়েছেন আর সে কিনা তাঁর নিজের বোন আর যেহেতু আরবে প্রথা অনুযায়ী মহিলাদের উপর হাত উঠানো নিষিদ্ধ ছিল, তাই তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে বললেন, আচ্ছা আমাকে দেখাও যে তোমরা কি পড়ছিলে।

একথা শুনে তাঁর বোন উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর মধ্যে সহানুভূতি ও কোমলভাব জেগেছে। তিনি বললেন, তোমার মত ব্যক্তির হাতে আমি সেই পবিত্র বস্তু দিতে প্রস্তুত নই। হযরত উমর বললেন, " তবে আমার কি করনীয়? "

বোন বলল: ওইখানে পানি রাখা আছে, স্নান করে এস, তবেই আমি তোমার হাতে সেই বস্তুটি দিতে পারি। হযরত ওমর স্নান সেরে এলেন। বোন কুরআন করীমের পৃষ্ঠাগুলি তাঁর হাতে দিলেন। হযরত ওমরের হৃদয়ে এক প্রকার পরিবর্তন এসে গিয়েছিল, তাই কুরআন করীমের আয়াত পাঠ করতেই তাঁর মন বিগলিত হয়ে যায়। আয়াত পাঠ করা শেষ করে তিনি অবলীলায় বলে উঠলেন:

এই বাক্য পাঠ করা শুনে সেই সাহাবীও বেরিয়ে আসেন যিনি ভয়ে লুকিয়ে পড়েছিলেন। এরপর হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন যে, আজকাল হযরত রসূলে করীম (সা.) কোথায় আছেন?

হযরত রসূলে করীম (সা.) সেই সময় বিরোধীতার কারণে ঘর পরিবর্তন করতে থাকতেন। তিনি বললেন, বর্তমানে তিনি 'দারে রাকিম'-এ অবস্থান করছেন। হযরত ওমর (রা.) তৎক্ষণাৎ খোলা তরবারী হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেই ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। বোনের মনে সংশয় দেখা দিল যে, তিনি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে যাচ্ছেন না তো? তাই তিনি সামনে এসে পথ আঁটকে দাঁড়ালেন এবং বললেন: খোদার কসম! আমি তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যেতে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আশ্বস্ত করবে যে তুমি কোন ক্ষতি করবে না।

হযরত ওমর (রা.) বললেন: আমি কথা দিচ্ছি যে, কোন ফাসাদ করব না।

হযরত ওমর (রা.) সেখানে দরজার কড়া নাড়লেন। হযরত রসুলে করীম (সা.) এবং সাহাবাগণ ভিতরে বসে ছিলেন। শিক্ষাদান চলছিল। একজন সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন যে, দরজায় কে? হযরত ওমর উত্তর দিলেন: ওমর।

সাহাবাগণ বললেন:হে রসুলুল্লাহ (সা.) দরজা খোলা উচিত নয়। নচেত সে কোন ফাসাদ করে বসবে। হযরত হামযা (রা.) সদ্য ঈমান এনেছিলেন। তিনি যোদ্ধার মত বললেন: দরজা খুলে দাও, আমি দেখছি সে কি করে।

অতএব একজন সাহাবা উঠে দরজা খুলে দিলেন। হযরত ওমর (রা.) এগিয়ে এলে হযরত রসুলে করীম (সা.) বললেন: হে ওমর ! তুমি আর কতদিন আমার বিরোধিতা করে যাবে? হযরত ওমর বললেন: হে রসুলুল্লাহ (সা.) আমি বিরোধিতা করতে আসি নি। আমি তো আপনার দাসত্ব স্বীকার করতে এসেছি।

সেই ওমর যিনি এক ঘন্টা পূর্বে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং হযরত রসুলে করীম (সা.) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন তিনি এক মূহুর্তে একজন উচ্চ শ্রেণীর মোমিনে পরিণত হলেন। হযরত ওমর (রা.) মক্কার নেতাদের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু বীরত্বের কারণে যুবকের উপর তাঁর বেশ প্রভাব ছিল। তিনি মুসলমান হয়ে ফলে সাহাবাগণ উত্তেজনা ও আবেগে নারা ধ্বনি দিতে লাগলেন। এর পর নামাযের সময় হলে রসুলুল্লাহ (সা.) নামায পড়ার উদ্যোগ করলেন। একঘন্টা পূর্বে যে ওমর হযরত রসুলুল্লাহ (সা.)কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, সেই ওমরই পুনরায় তরবারী বার করে বললেন:

"হে রসুলুল্লাহ (সা.)! খোদা তা'লার রসুল এবং তাঁর মান্যকারীরা লুকিয়ে নামায পড়বে আর মক্কার মুশরিকরা বাইরে বীর-বিক্রমে ঘুরে বেড়াবে- এটা কি করে সম্ভব হয়। আমি দেখব যে, আমাদেরকে খানা কাবায় নামায পড়া থেকে বাধা দেয়।" (তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪১-১৪৩)

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পিত হওয়া তিন বছর অতিক্রান্ত হল। তিনি (সা.) নীরবে প্রজ্ঞার সাথে সত্যের বাণী পৌঁছে দিচ্ছিলেন, কেননা খোদা তা'লার এটিই আদেশ ছিল। অতঃপর খোদা তা'লা প্রকাশ্যে প্রচার করার আদেশ দিলেন।

নবুয়তের ৪র্থ বছরে আল্লাহ্ তা'লা আদেশ দিলেন:

অতএব, তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তুমি (লোকদের নিকট) সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং মোশরেকদের উপেক্ষা কর।

(সুরা হিজর: ৯৫)

তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার আদেশ শিরোধার্য করে একদিন সাফা পাহাড়ে বিভিন্ন গোত্রের নাম ডেকে তাদেরকে সমবেত করলেন। আলে গালেব, লুব্বী গোত্র, আলে মুরা, আলে কুলাব এবং আলে কুসা-র লোক একত্রিত হলেন।

এরপর ৭ পাতায়...

জুমআর খুতবা

আমার পিতাকে যখন খলীফা মনোনীত করা হয় আর আল্লাহ্ যখন তাঁর হাতে নেতৃত্বের বাগডোর তুলে দেন তখন খিলাফতের সূচনাতেই তিনি চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন নৈরাজ্য এবং মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীকারকদের দৌরাত্ম্য আর মু রতাদ ও মুনাফেকদের বিদ্রোহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দেখেন। তাঁর ওপর এত বেশি বিপদাপদ নেমে আসে যে, তা পাহাড়-পর্ব তের ওপর আপতিত হলে নিমিষেই ধূলিসাৎ হয়ে যেতো এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু তাঁকে নবী-রসূলদের মত সুমহান ধৈর্য প্রদান করা হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.) সূক্ষ্ম ভৌগলিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন আর ভূমির চিহ্নাবলী ও জনবসতি এবং আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন পথ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। গোটা আরব উপদ্বীপ যেন তাঁর নখদর্পনে ছিল, যেমনটি বর্তমান যুগের আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলোতে হয়ে থাকে।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

ধর্মত্যাগীদের ফিতনা এবং বিদ্রোহকালে পরিচালিত সেনাভিযানের বর্ণনা

আবু বকর যেসব সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন তাদের নিজেদের মাঝেও যোগাযোগ ছিল এবং তা খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল, কেননা উক্ত সৈন্যদলগুলোর মাঝে সুদক্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি উত্তম শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৫ এপ্রিল , ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (১৫ শাহাদাত, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,গত খুতবার পূর্বের যে খুতবা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে তাতে বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছিল যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মুরতাদদেরকে তাদের ধর্মত্যাগের কারণে শাস্তি প্রদান করেন নি বরং বিদ্রোহ এবং যুদ্ধের কারণে তাদের প্রতিউত্তর দেওয়া হয়েছিল মাত্র। এ সম্পর্কে যুগের হাকাম ও আদাল (অর্থাৎ, ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী) হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র খিলাফতকালের সেই ধর্মত্যাগকে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র বীরত্ব ও সাহসিকতা কীরূপ ছিল তা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "সত্য-সন্ধানীদের এটি অজানা নয় যে, তাঁর খিলাফতকাল আশঙ্কা ও বিপদসংকু ল যুগ ছিল। যেমন- মহানবী (সা.)-এর ইন্তে কালের পর ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর বিপদাবলী নেমে আসতে থাকে। অগণিত মুনাফিক মুরতাদ হয়ে যায় আর মুরতাদরা ধৃষ্ট হয়ে ওঠে। মিথ্যাবাদীদের এক শ্রেণী নবুয়্যতের দাবী করে বসে আর অগণিত মরুবাসী বেদুঈন তাদের দলে যোগ দেয়। এক পর্যায়ে মুসায়লামা কায্ যাবের সাথে প্রায় এক লক্ষ অজ্ঞ ও দুরাচারী লোক যোগ দেয়। নৈরাজ্য ফুঁসে ওঠে, সমস্যা ঘনিভূত হয়, দূর-নিকটের সবকিছুই সমস্যা কবলিত হয়ে যায় আর মু'মিনরাপ্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হন। এমতাবস্থায় প্র ত্যেক ব্যক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় আর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাওয়ার মত ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মু'মিনরা এতটাই ছটফট করছিলেন যেন তাদের হৃদয়ে কয়লার আগুন জ্বালিয়ে দে ওয়া হয়েছিল অথবা তাদেরকে ছুরি দিয়ে জবাই করে দেওয়া হয়েছে। একদিকে তো তারা শ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর বিয়োগান্ত ক বেদনায় কাঁদছিলেন অপরদিকে সেসব অরাজকতার কারণে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলেন যা ভস্মকারী অগ্নির ন্যায় আবির্ভূত হয়েছিল। কোথাও শান্তির কোন নামগন্ধও ছিল না। নৈরাজ্যবাদীরা আবর্জনার স্তুপে গজিয়ে ওঠা সবুজ ঘাসের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। মু'মিনদের ভয়ভীতি ও উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। হৃদয় আশংকা ও ত্রাসে ভরে যায়। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.)-কে যুগের শাসক ও হযরত খাতামান্ নবীঈন (সা.)-এর খলীফা নিযুক্ত করা হয়। মুনাফিক, কাফির এবং মুরতাদদের আচার-আচরণ ও হাবভাব দেখে তিনি বেদনায় বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি আষাঢ়-শ্রাবনের বারিধারার ন্যায় অশ্রু বিসর্জন দেন এবং তাঁর অশ্রুধারা প্রবহমান ঝরনার ন্যায় বইতে থাকে আর তিনি (রা.) তাঁর আল্লাহ্র কাছে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য মিনতি করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমার পিতাকে যখন খলীফা মনোনীত করা হয় আর আল্লাহ্ যখন তাঁর হাতে নেতৃত্বের বাগডোর তুলে দেন তখন খিলাফতের সূচনাতেই তিনি চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন নৈরাজ্য এবং মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীকারকদের দৌরাত্ম্য আর মু রতাদ ও মুনাফেকদের বিদ্রোহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দেখেন। তাঁর ওপর এত বেশি বিপদাপদ নেমে আসে যে, তা পাহাড়-পর্ব তের ওপর আপতিত হলে নিমিষেই ধূলিসাৎ হয়ে যেতো এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু তাঁকে নবী-রসূলদের মত সুমহান ধৈর্য প্রদান করা হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অবশেষে আল্লাহ্র সাহায্য এসে যায় এবং ভণ্ড নবীদের হত্যা করা হয় আর মুরতাদদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়। নৈরাজ্য দূরীভূত ও সংকট অপসৃত হয়।বিপদাপদ কেটে যায় এবং সমস্যার নিরসন হয়। আর খেলাফত দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন আর তাদের ভয়-ভীতির অবস্থা শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দেন, তাদের জন্য তাদের ধর্ম কে সুদৃঢ় করে দেন। এক বিশাল জনগোষ্ঠিকেসত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নৈরাজ্যবাদীদের চেহারায় কালিমা লেপন করেন বা অপদস্ত করেন।তিনি স্বীয় প্র তিশ্রুতি পূর্ণ করেন আর নিজ বান্দা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) -এর সাহায্য করেন এবং বিদ্রোহী নেতা ও প্রতিমাগুলোকে ধ্বংস ও ধূলিসাৎ করে দেন। আল্লাহ্ কাফেরদের হৃদয়ে এমন ভীতির সঞ্চার করেন যে, তারা পিছপা হয়ে যায়, অবশেষে তারা প্রত্যাবর্তন করেএবং তওবা করে। এটিই কাহ্হার খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল আর তিনি সত্যবাদীদের মাঝে সবচেয়ে সত্যবাদী। অতএব গভীরভাবে প্রণিধান করে দেখ, কীভাবে খিলাফতের ভবিষ্যদ্বাণী বা প্রতিশ্রুতি সকল আনুষঙ্গিকতা ও লক্ষণসহ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সত্তায় পূর্ণ হয়েছে! আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এই তাৎপর্য বুঝার জন্য তোমাদের বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, গভীরভাবে প্রণিধান করে দেখ, তিনি যখন খলীফা হন তখন মুসলমানদের অবস্থা কেমন ছিল? বিভিন্ন বিপদাপদ বা সমস্যার কারণে ইসলাম অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে পুনরায় আপন শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর কূপ থেকে উদ্ধার করেছেন। নবুয়্যতের ভণ্ড দাবীদারদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে হত্যা করা হয়, ধর্মত্যাগীদের চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় ধ্বংস করা হয়।(এভাবে) আল্লাহ্ মু'মিনদের সেই ভয়-ভীতি থেকে যাতে তারা মৃতবৎ ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেন। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের পর

মু'মিন বান্দারা আনন্দিত হন আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে মুবারকবাদ জানান, তাঁকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা দিয়ে সাক্ষাত করতেন। তারা তাঁর প্রশংসা করতেন এবং মহামহিম প্রভুর দরবারে তাঁর জন্য দোয়া করতেন। তারা তাঁর প্রতি দ্রুত সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। আর তাঁর প্রতি তাদের ভালোবাসাকে তারা নিজেদের হৃদয়ের গভীরে স্থান দেন আর তাদের সকল বিষয়ে তার অনুসরণ করে চলতেন এবং তাঁর প্র তি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তারা নিজেদের হৃদয়কে আলোকিত এবং চেহারাকে উৎফুল্ল করেছেন। এভাবে তারা ভালোবাসা ও হৃদ্যতায় অগ্রগামী হয়েছেন এবং সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করে তাঁর আনুগত্য করেছেন। তারা তাঁকে এক আশিসময় ব্যক্তিত্ব এবং নবীদের ন্যায় ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত মনে করতেন আর এ সবকিছুই ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সততা ও দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে। "

(সিররুল খিলাফা, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ৪৭-৫১)

এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরবী পুস্তক 'সির্‌রুল খিলাফা'র উদ্ধৃতির উর্দু অনুবাদ।

ধর্মত্যাগের ফিতনা এবং বিদ্রোহ যখন দেখা দেয় তখন তা দমনের উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর (রা.) কতক সেনাভিযান পরিচালনা করেন যেমনটি এর আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর প্রায় পুরো আরব বিশ্ব ধর্মত্যাগের পথ অবলম্বন করে নিয়েছিল। এদের মাঝে কতিপয় এমন লোক ছিল যারা কেবল যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় যে দলের উল্লেখ করা হয় তারা কেবল ইসলাম ধর্ম থেকেই ফিরে যায় নি বরং বিদ্রোহও করেছিল এবং মুসলমানদের হত্যাও করছিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাদের শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করেন। যেমন- আল্ বিদায়া ওয়ান্নিহায়া পুস্তকে লেখা হয়েছে, হযরত উসামার বাহিনী বিশ্রাম গ্র হণের পর হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামী সেনাদলের সাথে তরবারি হাতে মদীনা থেকে বাহনে বসে যুল-কাস্‌সা অভিমুখে যাত্রা করেন যা মদীনা থেকে একরাত ও একদিন দূরত্বে অবস্থিত (সে যুগের সফরের মাধ্যম অনুযায়ী)। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যাদের মাঝে হযরত আলী (রা.)'ও ছিলেন সবাই হযরত আবু বকর (রা.)-কে জোরাজুরি করে বলছিলেন যে, আপনি মদীনায় ফিরে আসুন এবং মরুবাসীদের সাথে যুদ্ধের জন্য আপনি ছাড়া অন্য কোন বীর সেনাকে পাঠিয়ে দিন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার পিতা তরবারি হাতে বাহনের উপর আরোহণ করে যাত্রা করেন তখন হযরত আলী বিন আবী তালেব (রা.) এসে তাঁর উটনির নাকিল বা লাগাম ধরে নিবেদন করেন, হে রসূল (সা.)-এর খলীফা! আমি আপনাকে সে কথা বলবো যা মহানবী (সা.) উহুদের দিন বলেছিলেন, আপনি তরবারি কেন হাতে নিয়েছেন? আপনার প্রাণ বা অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে আমাদেরকে বিপদে ফেলবেন না। হযরত আলী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, আপনার প্রাণ হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে আমাদেরকে বিপদে ফেলবেন না। খোদার কসম, যদি আপনার জীবন হুমকিগ্রস্ত হয় তাহলে আপনার পর ইসলামী ব্যবস্থা চিরতরে হারিয়ে যাবে। এতে হযরত আবু বকর (রা.) ফিরে যান আর (কেবল) সেনাবাহিনীকে প্রেরণ করেন।

(আল্ বিদায়া ওয়ান্নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃ: ৩১১-৩১২)

হযরত উসামা এবং তার বাহিনী বিশ্রাম সেরে নেয় আর তাদের বাহনগুলোও উদ্যম ফিরে পায়, অধিকন্তু যাকাতের সম্পদও প্রচুর পরিমাণে হস্তগত হয়, যা মুসলমানদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল, তখন হযরত আবু বকর (রা.) সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করেন এবং এগারোটি পতাকা বাঁধেন।

একটি পতাকা হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের জন্য বাঁধেন এবং তাকে নির্দেশ দেন যেন তিনি তুলায়হা বিন খুয়ায়লেদকে দমনের জন্য বের হন। তাকে দমনের পর বুতাহা বিন মালেক বিন নুয়ায়রার মোকাবিলার জন্য যান, যদি তারা ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে অনড় থাকে। তারা সবাই যুদ্ধ করতে উদ্যত মুরতাদ ছিল। বুতাহা বনু আসাদ গোত্রের এলাকায় একটি ঝরনার নাম; তিনি তাদেরকে সেদিকে প্রেরণ করেন। হযরত ইকরামা বিন আবু জাহলের জন্য দ্বিতীয় পতাকা বাঁধেন আর তাকে মুসায়লামার মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার নির্দে শ দেন। তৃতীয় পতাকাহযরত মুহাজের বিন আবু উমাইয়্যার জন্য বাঁধেন এবং তাকে আনসী-র বাহিনীর মোকাবিলার নির্দেশ দেন। অতঃপর কায়েস বিন মাক্বশূহ এবং সেসব ইয়েমেনবাসীদের মোকাবেলার নির্দেশ দেন যারা আবনার সাথে যুদ্ধরত ছিল, তাকে নির্দেশ দেন আবনা'দের সাহায্য করতে। আবনা পারস্যবংশীয় একটি জাতির পরবর্তী প্রজন্ম ছিল যারা ইয়েমেনে বসতি স্থাপন করেছিল এবং আরবদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। তাকে সেখানকার কাজ শেষে কিন্দাকে দমনের জন্য হাযার মওত যাওয়ার নির্দেশ দেন। হাযার মওত ইয়েমেনের একটি অঞ্চল। চতুর্থ পতাকা হযরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আস-এর জন্য বাঁধেন এবং তাকে হামকাতাইন-এর দিকে প্রেরণ করেন, যা সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। পঞ্চম পতাকা হযরত আমর বিন আস-এর জন্য বাঁধেন এবং তাকে কুদা, ওয়াদীআ' এবং হারেস-এর বাহিনীর মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। ষষ্ঠ পতাকা হযরত হুযায়ফা বিন মিহসান গালফানি-র জন্য বাঁধেন এবং তাকে দাবাবাসীদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার নির্দেশ দেন। দাবা ওমানে আরবদের একটি বাজার এবং ওমানের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শহর ছিল। সেখানে বাজার বসতো। সপ্তম পতাকা হযরত আরফাজা হারসামা'র জন্য বাঁধেন এবং তাকে মাহরা অভিমুখে যাওয়ার নির্দে শ দেন। মাহরা ইয়েমেনের একটি অঞ্চলের নাম। হযরত আবু বকর তাদের উভয়কে এক স্থানে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেনকিন্তু যেসব এলাকার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে সেখানে তারা একে অন্যের আমীর হবেন। অর্থাৎ একজন ইয়েমেনে আমীর হবেন আর দ্বিতীয়জন অন্যত্র। ইকরামা বিন আবু জাহলের পিছনে হযরত আবু বকর (রা.) [অষ্টম পতাকা বেঁধে] শুরাহ্‌বিল বিন হাসানাকে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, ইয়ামামার কাজ শেষে কুযাআকে দমনের জন্য চলে যেও আর মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তুমি-ই নিজ বাহিনীর আমীর হবে। নবম পতাকা হযরত তুরায়ফা বিন হাজেয-এর জন্য বাঁধেন এবং তাকে বনু সুলায়েম এবং হওয়াযেন গোত্রের মোকাবিলার নির্দেশ দেন। দশম পতাকা হযরত সুয়ায়েদ বিন মুকাররিনের জন্য বাঁধেন এবং তাকে ইয়েমেনের তিহামার দিকে যাওয়ার নির্দে শ উদ্দেশ্যে যান। আর একাদশতম পতাকা হযরত আলা বিন হাযরামি (রা.)-এর জন্য বাঁধেন এবং তাকে বাহরাইন যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। অতএব উক্ত আমীরগণ যুল কাসসা থেকে নিজ নিজ গন্তব্যে যাত্রা করেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭) (সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত ও কারনামে, পৃ: ২৮৮) (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫২৭) (মুজামুল ওয়াসিত)

হযরত আবু বকর (রা.) প্রত্যেক দলের আমীরকে যাত্রা পথের শক্তিশালী মুসলমানদেরকে নিজেদের সাথে নেওয়ার আর কতিপয় শক্তিশালী ব্যক্তিদের এলাকার সুরক্ষার্থে পিছনে রেখে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর উক্ত বণ্টনের উল্লেখ করতে গিয়ে জনৈক লেখক লিখেন, যুল কাসসা সামরিক কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারিত হয়। এখান থেকে সুশৃঙ্খল ইসলামী বাহিনীসমূহ ধর্মত্যাগের অশুভ প্রবণতাকে দমনের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের দিকে যাত্রা করে। হযরত আবু বকরের পরিকল্পনা থেকে অনন্য বুদ্ধিমত্তা এবং সূক্ষ্ম ভৌগলিক অভিজ্ঞতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সেনাদলগুলোর বণ্টন এবং তাদের গন্তব্য নির্ধারণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত আবু বকর (রা.) সূক্ষ্ম ভৌগলিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন আর ভূমির চিহ্নাবলী ও জনবসতি এবং আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন পথ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন।

গোটা আরব উপদ্বীপ যেন তাঁর নখদর্পনে ছিল, যেমনটি বর্তমান যুগের আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলোতে হয়ে থাকে। যে-ই সৈন্যবাহিনীকে রওয়ানা করা, তাদের গন্তব্য নির্ধারণ, বিভক্ত হওয়ার পর (সৈন্যদলগুলোকে) সংঘবদ্ধ করা এবং পুনরায় সংঘবদ্ধ হবার জন্য বিভক্ত করার বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করবে, সে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে, এই পরিকল্পনা গ্রহণসমগ্র আরব উপদ্বীপের ক্ষেত্রে আদর্শ ও যথার্থ ধারণার ভিত্তিতে করা হয়েছিল, আর সেই সৈন্যদলগুলোর সাথে যোগাযোগও ছিল একান্ত নিখুঁত। আবু বকর সারাক্ষণ এই খবর পেতেন যে,সৈন্যদল কোথায় রয়েছে; আর তাদের গতিবিধি ও যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত থাকতেন। আর এ-ও জানতেন যে, তারা কী কী সাফল্য অর্জন করেছে এবং আগামীকাল তাদের পরিকল্পনা কী? যোগাযোগ ব্যবস্থা একান্ত নিখুঁত ও দ্রুত হতো এবং রণক্ষেত্র থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সংবাদ সদর দপ্তর মদীনায় আবু বকরের কাছে আসতে থাকতো; পুরো সেনাদলের সাথে সর্বদা নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকতো। সদর দপ্তর ও যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে সামরিক সংবাদ পৌঁছানোর কাজে আবু খায়সামা আনসারী, সালামা বিন সালামা, আবু বারযা আসলামী ও সালামা বিন ওয়াকশ অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

আবু বকর যেসব সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন তাদের নিজেদের মাঝেও যোগাযোগ ছিল এবং তা খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলোর মধ্যে

অন্যতম ছিল, কেননা উক্ত সৈন্যদলগুলোর মাঝে সুদক্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি উত্তম শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল।

এছাড়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও আগে থেকেই ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে গাযওয়া [এমন যুদ্ধ যাতে মহানবী (সা.) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন] ও সারিয়্যাসমূহে [এমন যুদ্ধাভিযান যেখানে মহানবী (সা.) নিজে উপস্থিত ছিলেন না] এসব সামরিক কর্ম কাণ্ডের ভাল অভিজ্ঞতা তাদের অর্জিত হয়েছিল। আবু বকরের শাসনাধীন সামরিক ব্যবস্থ াপনা আরব উপদ্বীপের সকল সামরিক শক্তির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখতো। আর সেসব সৈন্যদলের নেতৃত্বে ছিলেন 'আল্লাহ্‌র তরবারি' খ্যাত খালিদ বিন ওয়ালীদ, যিনি ইসলামের জয়যাত্রা ও মুরতাদবিরোধী অভিযানসমূহে অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর এই বণ্টন একান্ত গুরুত্ব পূর্ণ সামরিক পরিকল্পনার অধীনে সম্পন্ন করা হয়েছিল, কারণ মুরতাদরা তখন পর্যন্ত নিজ নিজ অঞ্চলে বিভক্ত ছিল; [অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, সংঘবদ্ধ হয় নি] মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা তখনও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। বড় গোত্রগুলো দূর-দূরান্তে র অঞ্চলগুলোতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হবার মতো যথেষ্ট সময় তাদের কাছে ছিল না; কারণ ধর্মত্যাগের হিড়িক আরম্ভ হওয়ার তখনও তিন মাসের বেশি সময় পার হয় নি। দ্বিতীয়ত তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আক্রমণের শংকা তারা বুঝে উঠতে পারে নি। তারা ধরে নিয়েছিল, কয়েক মাসের মধ্যেই সকলমুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এ কারণেই হযরত আবু বকর অতর্কিত আক্রমণ করে তারা নিজেদের মিথ্যা বিশ্বাসের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তাদের শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিলেন। এজন্য হযরত আবু বকর তাদের নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বেই তাদের শাস্তি দেন আর তাদেরকে এই সুযোগই দেন নি যে, তারা মাথাচাড়া দিবে বা বড়বড় বুলি আওড়াবে যার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কষ্টে নিপতিত করতে পারে।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত ও কারনামে, পৃ: ২৮৮-২৯০)

হযরত আবু বকরের পক্ষ থেকে কর্মকর্তা নিযুক্তি প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে জনৈক লেখক লিখেন, এক নম্বর বিষয় হলো, উক্ত পরিকল্পনার অধীনে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় যে, সৈন্যদলগুলোর মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা সর্বদা যেন বজায় থাকে। যদিও তাদের অবস্থান ও গন্তব্য ভিন্ন ভিন্ন ছিল, কিন্তু সবাই একই শিকলের কড়া ছিল। তাদের পরস্পর মিলিত হওয়া বা পৃথক হওয়া ছিল একই উদ্দেশ্যের নিরিখে, আর খলীফা মদীনায় অবস্থানরত হলেও, যুদ্ধের যাবতীয় বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাঁর হাতেই ছিল, [অর্থাৎ খলীফার হাতেই ছিল।] দ্বিতীয়ত, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রাজধানী মদীনার সুরক্ষার্থে সেনাবাহিনীর একাংশ নিজের কাছে রাখেন, সেই সাথে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের একটি দলও নিজের কাছে রাখেন। তৃতীয়ত, আবু বকর জানতেন যে, ধর্মত্যাগে প্রভাবিত এলাকাগুলোতে ইসলামী শক্তির উপস্থিতি বিদ্যমান। তাঁর এই দুশ্চিন্ত াও হয় যে, কোথাওএই মুসলমানরা মুশরিকদের ক্রোধের লক্ষ্যস্থলে না পরিণত হয়! এজন্য (সৈন্যদলের) নেতাদেরকে তিনি নির্দেশ দেন যে, তাদের মধ্য থেকে যারা শক্তি-সামর্থ্য রাখে তাদেরকে দলভুক্ত করে নাও আর ঐসকল এলাকার সুরক্ষাকল্পে কিছু লোক সেখানে নিয়োজিত কর। চতুর্থত, মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) "আল-হারবু খুদআহ" নীতি অবলম্বন করেন। সেনাদলের এক ধরনের লক্ষ্য কিছু প্রকাশ করতেন অথচ উদ্দেশ্য হত ভিন্ন। তিনি সর্বোচ্চ সাবধানতা এবং সতর্কতা অবলম্বন করেন যেন পরিকল্পনা প্রকাশ না পেয়ে যায়। এভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নেতৃত্বে রাজনৈতিক পারদর্শিতা, জ্ঞানের গভীরতা ও সু প্রোথিত জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি আর বিজয় ও ঐশী সাহায্য-সহযোগিতা দর্শনীয়ভাবে চোখে পড়ে।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত ও কারনামে, পৃ: ২৯৭-২৯৮)

সে মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা.) দুটি 'ফরমান' তথা অধ্যাদেশ লিখেছিলেন যার একটি ছিল আরব গ্রোত্রগুলোর নামে এবং অপরটি ছিল সেনাপ্রধানদের জন্য পথ-নির্দেশিকাস্বরূপ।

(হযরত আবু বাকার কে সরকারী খুতুত, প্রণেতা- খুরশেদ আহমদ ফারুক, পৃ: ২২)

ড. আলী মুহাম্মদ সালাবী উক্ত পত্রের বিষয়ে লিখেন, ইসলামী সৈন্যদলের প্রস্তুতি এবং সুপরিকল্পিত বিন্যাসের পর আমরা দেখি, পত্রের মাধ্যমে প্র চার ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম অব্যাহত ছিল আর তিনি (তথা হযরত আবু বকর) এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি একটি গুরুত্ব পূর্ণ পত্র লেখেন যা ছিল সীমিত বিষয় সম্বলিত। মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যদল প্রেরণ করার পূর্বে তিনি (রা.) সেই পত্র মুরতাদ এবং (ইসলামে) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ তথা সবার মাঝে উচ্চমাত্রায় যথাসাধ্য প্রচার করার চেষ্টা করেন। গোত্রে গোত্রে লোকদের প্রেরণ করেন এবং তিনি আদেশ প্রদান করেন যে, সেখানে পেঁ ছৈ প্রত্যেক জনসভায় এই পত্র পড়ে শোনাবে আর যে-ই এই পত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবগত হবে তাকে আদেশ করেন যে, সে যেন ঐ লোকদের কাছে উক্ত (পত্রের) বিষয়বস্তু পৌঁছে দেয়, যাদের কাছে তা পৌঁছায় নি। হযরত আবু বকর (রা.) উক্ত পত্রে সর্বসাধারণকে উদ্দেশ্য করে লিখেন, হোক সে ইসলামে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত অথবা মুরতাদ।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত ও কারনামে, পৃ: ২৯০-২৯১)

আরব গোত্রগুলোর উদ্দেশ্যে প্রেরিত হযরত আবু বকর (রা.)-এর উক্ত পত্রের বিষয়বস্তু তাবারী সবচেয়ে বেশি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)'ও নিজ পুস্তক 'সিররুল খিলাফা'য় উক্ত পত্রের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, উক্ত পত্রটি এখানে তুলে ধরা সঙ্গত মনে করছি যেটি সিদ্দিকে আকবর সেসকল আরব গোত্রগুলোর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এই পত্রের বিষয়ে যারা অবগত হবে, তারা সিদ্দিকে আকবরের আল্লাহ্‌র নিদর্শনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং মহানবী (সা.) যা-ই সূচিত করেছেন তার সুরক্ষার ক্ষেত্রে দৃঢ়তাকে দেখে যেন ঈমান এবং অন্তর্দৃষ্টিতে উন্নতি করতে পারে। [এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) উক্ত পত্রটি হুবহু তুলে ধরেন]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এতদ্বারা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর খলীফা আবু বকরের পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের যার কাছেই এ পত্র পৌঁছে তাকে জানানো যাচ্ছে যে, সে নিজে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকুক বা পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়ে থাকুক, যে সঠিক পথের অনুসরণ করে আর সত্য গ্রহণের পর ভ্রষ্টতা ও অন্ধত্বের দিকে ফিরে না যায় তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমাদের সামনে সেই খোদার প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। তিনি যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন আমরা তা মান্য করি আর যে তা অস্বীকার করে আমরা তাকে কাফের আখ্যা দিই এবং আমরা তার বিরুদ্ধে জিহাদ করি। এরপর স্মরণ থাকে! আল্লাহ্ তা'লা নিজ সন্নিধান থেকে মুহাম্মদ (সা.)-কে, যারা জীবিত তাদের সতর্ক করতে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে শুভ সংবাদদাতা, সতর্ককারী, খোদার দিকে তাঁর নির্দেশে আহ্বানকারী ও দীপ্তিমান সূর্য হিসেবে মানবের প্রতি সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন। অতএব যে তাঁকে (সা.) গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ তাকে সত্যের পানে হেদায়াত দিয়েছেন আর যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে তার বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ততক্ষণ যুদ্ধ করেছেন যতক্ষণ সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা বাধ্য হয়ে ইসলামের দিকে ফিরে না এসেছে। এরপর তিনি (সা.) ইন্তে কাল করেন। তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে পৃথিবীতে প্রবর্তন করেছেন এবং উম্মতের হিতসাধনের জন্য সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁর ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর ও ইসলামের অনুসারীদের জন্য তাঁর এ কিতাবে যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন- এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, অতএব তিনি বলেন, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ অর্থাৎ, তুমিও মৃত্যুবরণ করবে আর নিশ্চয়ই তারাও মৃত্যুবরণ করবে। (সূরা আয্ যুমার: ৩১) এরপর বলেন, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ আর আমরা কোন মানুষকে তোমার পূর্বে চিরদিন বাচিয়ে রাখি নি। اَفَاۡئِنۡ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ অতএব যদি তুমি মারা যাও তাহলে তারা কি চিরদিন বেচে থাকবে? (সূরা আল্ আম্বিয়া: ৩৫) এরপর মু'মিনদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوۡلٌ ۚ قَدۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۟ئِنۡ مَّاتَ اَوۡ قُتِلَ انْقَلَبۡتُمۡ عَلٰۤى اَعۡقَابِكُمۡ ؕ وَمَنۡ يَّنۡقَلِبۡ عَلٰى عَقِبَيۡهِ فَلَنۡ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيۡـًٔا ؕ وَسَيَجۡزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيۡنَ

অর্থ: আর মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। নিশ্চয়ই তার পূর্বের সকল রসূল গত হয়েছেন। অতএব তিনিও যদি মারা যান বা নিহত হন তাহলে তোমরা কি তোমাদের পূর্বেরঅবস্থায় ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের অবশ্যই প্রতিদান দিবেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)অতএব, তিনি পুনরায় লিখেন, অতএব যে মুহাম্মদ (সা.)-এর ইবাদত করতো তার জানা উচিত, তিনি (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন আর যে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ইবাদত করতো তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তার অপেক্ষায় বসে আছেন, তিনি চিরঞ্জীব ও জীবনদাতা, চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা। তিনি মরবেন না আর ঘুম ও তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি নিজ কাজের রক্ষণাবেক্ষণকারী, শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ

করেন এবং তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। আমি তোমাদেরকে খোদার তাকওয়া অবলম্বন এবং তার সন্নিধানে তোমাদের যে ভাগ্য ও অদৃষ্ট নির্ধারিত আছে তা অর্জনের চেষ্টা করার পাশাপাশি এবং তোমাদের নবী (সা.) কর্তৃক আনিত শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তোমাদের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছি। এছাড়া তোমরা তাঁর (সা.) পথনির্দে শনা হতে পথের দিশা নাও এবং আল্লাহ্‌র ধর্মকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখ, কেননা আল্লাহ্ যাকেহেদায়াত না দেন সে ভ্রষ্ট, যাকে তিনি রক্ষা না করবেন সে পরীক্ষায় পড়বে। তিনি যাকে সাহায্য করবেন না তার কোন সাহায্য-সহায়তাকারী নেই। সুতরাং সে-ই হেদায়াতপ্রাপ্ত যাকে তিনি হেদায়াত দেন আর যাকে তিনি ভ্রষ্ট আখ্যা দেন সে-ই পথভ্রষ্ট। আল্লাহ্ বলেন, مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا অর্থাৎ, আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দেন সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তার জন্য তুমি কোন হিদায়াতদাতা বন্ধু খুঁজে পাবে না। (সূরা আল্ কাহফ: ১৮) এ পৃথিবীতে তার কৃত কোন কর্ম ততক্ষণ গৃহীত হবে না যতক্ষণ সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করবে, পরকালেও তার পক্ষ থেকে কোন মূল্য বা বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না। আমার কাছে এ সংবাদ এসেছে, তোমাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ ও এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌কে ধোকা দিয়ে এবং তাঁর বিষয়ে অজ্ঞতা প্রদর্শন করে শয়তানের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ ধর্মকে ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۭ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَاۗءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۭ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا (الکہف:51)

অর্থ: আর স্মরণ কর যখন ফিরিশতাদের বলেছিলাম তোমরা আদমের জন্য সিজদাবনত হও তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করলো। সে ছিল জিনদের একজন। অতএব সে তার প্রভু প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে নিজেদের বন্ধু বানাচ্ছো অথচ তারা তোমাদের শত্রু? যালেমদের জন্য বিনিময় অতি মন্দ হয়ে থাকে। (সূরা আল্ কাহফ: ৫১)

তিনি আরো বলেন, اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۭ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ অর্থ: নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা তাকে শত্রু বলেই জেনো। সে নিজের দলবলকে শুধু এ জন্যই ডাকে যেন তারা লেলিহান আগুনের অধিবাসী হয়ে যায়। (সূরা আল্ ফাতির: ৭)এই পত্রের উল্লেখ করে তিনি বলেন, আর আমি মুহাজের ও আনসার এবং উত্তম আমলের অনুসারী তাবেঈনদের সেনাদলের জন্য অমুক ব্যক্তিকে (আমীর) নিযুক্ত করে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি এবং তাকে আমি আদেশ দিয়েছি, সে যেন কারো সাথে যুদ্ধ না করে এবং আল্লাহ্ তা'লার বার্তা না পৌঁছানো পর্যন্ত সে যেন তাকে হত্যাও না করে।

আর সে যদি এই বার্তা গ্রহণ করে, স্বীকৃতি দেয় এবং বিরত হয় আর সৎকর্ম সম্পাদন করে তাহলে তাকে যেন সে মেনে নেয় এবং এক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করে। কিন্তু যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে তার জন্য আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি, সে যেন তার সাথে এবিষয়ে যুদ্ধ করে এবং যাদেরকে পরাস্ত করবে তাদের কাউকেই যেন ছাড় না দেয়। এরপর সে যেন তাদেরকে হয় আগুনে পুড়িয়ে মারে না হয় যে কোনভাবেই হোক তাদের হত্যা করে। মহিলা ও শিশুদের যেন বন্দি করে এবং কারো কাছ থেকেই যেন ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ না করে। এরপর যে তার আনুগত্য করবে তা হবে তার জন্য কল্যাণকর কিন্তু যে তাকে পরিত্যাগ করবে সে আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করতে পারবে না। এছাড়া আমি আমার বার্তাবাহককে নির্দেশ দিয়েছি, সে যেন আমার এই পত্র তোমাদের প্রত্যেক সমাবেশে পাঠ করে শোনায় আর আযানই হল ইসলামের ঘোষণা। কাজেই মুসলমানরা যখন আযান দিবে তখন তারাও যদি আযান দেয়, তাহলে তাদের ওপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু তারা যদি আযান না দেয় তাহলে তাদের ওপর দ্রুত আক্রমণ কর আর যখন তারা আযান দিবে তখন তাদের ওপর যা কিছু ফরয বা আবশ্যিক কর্তব্য তা দাবি কর আর এখন যদি অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদের ওপর ত্বরিৎ আক্রমণ কর কিন্তু যদি স্বীকার করে নেয় তাহলে তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হোক।

(সিররুল খিলাফাহ, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ১৯০-১৯৪)

যাহোক, এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা ছিল (এই হল তা), অর্থাৎ কেন তাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে এবং সবার সাথে এমন আচরণ কেন করা হয়েছে? এর কারণ হলো, এসব লোক যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল, মুসমানদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছিল আর তারা কেবল যুদ্ধ করছিল তা-ই নয় বরং অত্যাচার ও নিপীড়নও করছিল এবং তাদের অঞ্চলে যেসব অসহায় মুসলমান ছিল বা থাকত তাদের ওপরও নির্যাতন করছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) দ্বিতীয় যে পত্রটি এসব সেনাদলের আমীরদের নামে লিখেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল এগারো। তাদের কথা পূর্বে ই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই পত্রটি সেনাদলের আমীরদের নামে ছিল। সেটি নিম্নে বর্ণিত হলো।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এই পত্রটি রসূল (সা.)-এর খলীফা আবু বকরের পক্ষ থেকে অমুক ব্যক্তির নামে লেখা হয়েছে। (আর তখন লেখা হয়েছে) যখন তিনি তাদেরকে মুসলমান সেনাদলের সাথে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অর্থাৎ এতে প্রত্যেক আমীরের নাম লেখা হয়েছিল। তিনি (রা.) আমীরকে জোরালো নির্দেশ দিয়ে লিখেন, সে যেন যথাসাধ্য সকল বিষয়ে স্পষ্টতঃ আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করে। তাকে আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে সংগ্রাম করার এবং সেসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন যারা আল্লাহ্ বিমুখ হয়েছে এবং ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করে শয়তানী কামনা বাসনার দাসত্ব করেছে। সর্ব প্রথম তাদের সামনে সত্য পরিস্কারভাবে তুলে ধরবে এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে। তারা যদি এটি গ্রহণ করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু তারা যদি এটি মেনে না নেয় তাহলে তাদের ওপর তাৎক্ষণিকভাবে হাল্লা করবে, যতক্ষণ না তারা তার সামনে অবনত হয়। এরপর সে তাদেরকে তাদের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বলবে আর তাদের জন্য যাকিছু দেওয়া আবশ্যক তা তারা আদায় করবে এবং যা তাদের অধিকার তা তাদেরকে প্রদান করবে। সে যেন তাদেরকে অবকাশ না দেয়, অর্থাৎ এমন সুযোগ যেন না দেয় যার ফলে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসবে। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে যেন তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত না রাখে। মুসলমানরা যদি মনে করে, এরা এমন মানুষ যারা বিরত হবে না এবং তারা যুদ্ধ করতে চায় সুতরাং তাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধা দিবে না। কেননা সেই অঞ্চলের মানুষই ভালো জানত, তিনি নেতাদেরকে এ নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি মহা সম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করেছে এবং তাঁর আনুগত্য করেছে তার একথা মেনে নিবে এবং ন্যায়সংগত পন্থায় তাকে সাহায্য করবে। আর কেবল তার সাথেই যুদ্ধ করা হবে যে কিনা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যা এসেছিল তা স্বীকার করার পর আবার অস্বীকার করে। সে যদি তবলীগ গ্রহণ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি নেই অবশ্য এরপর সে যা গোপন করেছে আল্লাহ্ তার হিসাব নিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাণী মেনে নেয় নি তার সাথেযেন যুদ্ধ করা হয় এবং তাকে হত্যা করা হয়, সে যেখানেই থাকুক না কেন আর যত সম্পদশালীই হোক না কেন। ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া কারো কাছ থেকে আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না।

অতএব যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বীকার করে তার কাছ থেকে তা যেন গ্রহণ করা হয় এবং তাকে ইসলামী শিক্ষা প্রদান করা হয় আর যে অস্বীকার করে, অর্থাৎ মুসলমান হবার পর মুরতাদ হয়ে গেছে আবার যুদ্ধও করছে, তাহলে তো সে ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থি কাজ করছে, তাকে বলে দাও, ইসলাম কী এবং এর প্রকৃত তাৎপর্য কী? তোমরা মুসলমান হবার দাবি করে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পার না। যে অস্বীকৃতি জানাবে তার সাথে যুদ্ধ করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা যদি তাকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন তাহলে তাদেরকে অস্ত্র ও আগুন দিয়ে হত্যা করা হবে। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা যে গনীমতের মাল দান করবেন তা থেকে এক পঞ্চমাংশ আমাকে পাঠাবে আর বাকিটা বণ্টন করে দিবে। এরপর সেই সেনাপতি যেন তার সঙ্গীদের ত্বরাপরায়ণতা এবং নৈরাজ্য করা থেকে বিরত রাখে আর তাদের মাঝে যেন কোন বহিরাগতকে অন্তর্ভুক্ত না করে যতক্ষণ না সে জেনে নেয় তার মাঝে কতটা যোগ্যতা রয়েছে। এমন যেন না হয় যে, (পরে) গুপ্তচর হবে, অর্থাৎ কাউকে অন্তর্ভুক্ত করবে আর সে গুপ্তচর হবে। ভালোভাবে অনুসন্ধান ও যাচাইবাছাই করার পর দলে নিবে। সে গুপ্তচর হলে তার কারণে মুসলমানদের ওপর বিপদ আসতে পারে। সফর এবং সফর বহির্ভূত অবস্থায় মুসলমানদের সাথে নমনীয় ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে আর তাদের খোঁজখবর নিতে থাকবে। সৈন্যদের একাংশকে অপর অংশের চেয়ে তাড়াতাড়ি করার নির্দেশ দিবে না। মুসলমানদের সাথে আচারব্যবহার ও আলাপচারিতায় ভদ্র তা এবং কোমলতা প্রদর্শন করবে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৮-২৫৯)

এখন কিছু বিষয় এমন রয়েছে যার ব্যাখা করার প্রয়োজন, কিন্তু ব্যাখ্যা করা হয় নি। ফলে অনেক সময় ইসলাম সম্পর্কে মন্দ ধারণাও সৃষ্টি হয়ে যায়। গত খুতবায় আমি এর ব্যাখ্যা দিয়েছি যে, এসব মুরতাদ এমন ছিল যারা যুদ্ধ করেছে। তারা যুদ্ধবাজ ছিল আর তারা কেবল যুদ্ধই করে নি বরং তাদের এলাকায় যেসব মুসলমান ছিল তাদের ওপরও এরা অত্যাচা র

করেছে। তাদেরকে মেরেছে, আগুনে পুড়িয়েছে, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকেও জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, অবশ্যই প্রতিশোধ নিতে হবে আর তাদেরকেও সেই পদ্ধতিতেই যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও এই পত্রটি কোট

করেছেন যে, একই পদ্ধতিতে তাদেরকেও শাস্তি দিতে হবে। কেননা এটিই কুরআন শরীফ তথা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ যে, যেমনটি কেউ করে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাকে ঠিক তেমনই শাস্তি দাও। কিন্তু একজন লেখক, অর্থাৎ এই ড. আলী মুহাম্মদ সালাবী সাহেবই একস্থানে এবিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবে লিখেন যে, এতে উল্লেখ রয়েছে মুরতাদ বিদ্রোহীদের যেন আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। কাউকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেওয়া তো বৈধ নয়। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ হল, إِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ। অর্থাৎ আগুনের শাস্তি দেওয়া কেবল আল্লাহ্ তা'লার কাজ, কিন্তু এখানে তাদেরকে আগুনে পোড়ানোর নির্দেশ দেওয়ার কারণ হল, এসব দুষ্ট অপকল্পশীলরা মু'মিনদের সাথে এই আচরণই করেছিল, কাজেই এটি কিসাস বা প্রতিশোধস্বরূপ ছিল।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত ও কারনামে, পৃ: ২৯৩)

হযরত আবু বকর (রা.)'র এই চিঠির উল্লেখ করে এই পুস্তকে এটিও লেখা আছে, মুসলমানদের কাতারে ফিরে আসতে যে অস্বীকৃতি জানায় ও ধর্মত্যাগের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে সে যুদ্ধবাজ, তাই তার ওপর আক্রমণ করা আবশ্যক আর তাকে যেন হত্যা করা হয় ও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। (সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত ও কারনামে, পৃ: ২৯৪-২৯৫

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফেও এটি বলেছেন, তোমাদেরকে যারা কষ্টে নিপতিত করে তাদেরকে তোমরা সেভাবেই শাস্তি দাও যেমনটি তোমাদের সাথে তারা করেছে। যেভাবে আমি গত খুতবাতেও উল্লেখ করেছি এবং এখনই বলেছি, তারা মুসলমানদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা এবং তাদেরকে ঘৃণ্য পন্থায় হত্যা করার অপরাধ করেছিল। তাদেরকে আগুনে পুড়িয়েছে, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাদেরকে জ্বালিয়েছে, তাদের স্ত্রী-সন্তান সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে, তাদের অঙ্গচ্ছেদ করেছে আর এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ঠিক সেভাবেই তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, অর্থাৎ যারা এতে জড়িত ছিল তাদের সাথে সেই আচরণই করবে যা তারা মুসলমানদের সাথে করেছিল।

যাহোক, এই স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। রমযানে সম্ভবত অন্য খুতবাও মাঝে আসতে থাকবে। হতে পারে সময় লাগবে কিন্তু যাহোক, আগামীতে এ বিষয়ে যে খুতবাই দেওয়া হবে তাতে এর বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে।

****

(১ম পাতার শেষাংশ...) উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে এই প্রশ্ন উঠতে পারে, যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, লোকেরা এতদিন হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত-ই মেনে চলছিল আর এতে তারা কোনও রকম মতানৈক্য করত না। তবে কি রসুল করীম (সা.)-এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ শরিয়ত বা পরিপূর্ণ শিক্ষা আসত না? এর উত্তর হল, এটি ধারণা করা মাত্র। বাস্তবে মতানৈক্য থেকে মানুষ বিরত হত না আর এই শিক্ষার আগমণেও অন্তরায় সৃষ্টি হত না। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় যে, এমন পরিস্থিতি তৈরী হল, তাই আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তর দিয়েছেন।

لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ
لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا (بنی

যদি পৃথিবীতে সকলে ফিরিশতা হত, অর্থাৎ সকলে পুণ্যবান হত, তবে আমরা তাদের প্রত্যেকের উপর নিজের বাণী নাযেল করতাম। অর্থাৎ এমন পরিস্থিতিতে জাতির প্রত একজন নবী প্রেরণ করা হত না, বরং তাঁরা সকলেই নবী হতেন আর এক্ষেত্রে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যানের কোনও প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু জগতবাসী সকলে কখনও পুণ্যবান হয় না আর খোদা তা'লাও নবীর ধারা ব্যহত করেন নি।

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ আয়াতে নিবন্ধের দ্বিতীয় দিকটির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যারা মতানৈক্য করে তাদের জন্য তোমার কাজ হল কুরআন করীমের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাদের সেই মতানৈক্য দূর করা এবং যারা মোমেন কুরআনকে তাদের জন্য উন্নতির ধাপ এবং রহমত লাভের মাধ্যম বানানো।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৯)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

তাদের মধ্যে আবু লাহাবও ছিল।

তিনি (সা.) নিজের বক্তব্য শুরু করলেন।

তোমরা আমার আত্মীয়। আমাকে দীর্ঘ সময় ধরে চেন। আমার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সম্যক অবগত আছ। তোমরা বল যে, আমি কি কখনো মিথ্যা বলেছি?' তারা একবাক্যে উত্তর দিল: কক্ষনো নয়, আপনি সর্বদা সত্য বলেন।" তিনি (সা.) বললেন: " আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এই ছোট পাহাড়টির পেছনে একটি বিশাল বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য লুকিয়ে আছে, তবে কি তোমরা বিশ্বাস করবে?"

যদিও সেখানে এমন কোন আড়াল হওয়ার স্থান ছিল না যার পিছনে একটি সৈন্য বাহিনী লুকিয়ে থাকতে পারে বরং পাহাড়ের পিছনে একটি প্রশস্ত ময়দান ছিল। কিন্তু তা সত্বেও তারা বলল, যদি আপনি বলেন তবে বিশ্বাস করব। কেননা, আমরা জানি যে, আপনি কখনো মিথ্যা বলেন না।

হযরত রসুল করীম (সা.) বললেন: যদি তোমরা আমাকে সত্যবাদী মনে কর, তবে আমি তোমাদেরকে বলছি, খোদা তা'লা আমাকে বলেছেন যে, আমি তাঁর রসুল এবং তিনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং তোমাদেরকে মূর্তি পূজা থেকে বিরত রাখি। যদি তোমরা আমার কথা না শোন তবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

মক্কাবাসীরা যারা কিনা কিছুক্ষণ পূর্বেই বাহ্যতঃ অসম্ভব বিষয়ের উপরও তাঁকে সত্য বলে স্বীকার করছিল, তারাই সহসা এই কথাটি স্বীকার করতে অস্বীকার করে বসল। তাঁর কথা আগে শুনলও না। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি আরম্ভ করে দিল যে দেখ! এর কি হয়েছে! কেমন নির্বোধের মত কথা বলছে! একথা বলে তারা এদিক সেদিক চলে গেল।

আবু লাহাব বলল, হে মহম্মদ! তুমি নিপাত যাও। তুমি এই সামান্য বিষয়ের জন্য আমাদেরকে একত্রিত করেছ? (তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড)

রসূলুল্লাহ (সা.) দেখলেন যে, তাঁর কথাকে কেউ গুরুত্ব দিল না।তাই তিনি (সা.) অন্য পথ অবলম্বন করলেন। হযরত আলি (রা.)কে বললেন, আব্দুল মুতালেবের পরিবারকে ভোজনের আমন্ত্রন দাও। তিনি (সা.) চাইছিলেন, ভোজনের পর তাদেরকে আল্লাহ্ বাণী শোনাবেন। সকল নিকটাত্মীয়রা এলেন, যারা প্রায় চল্লিশ জন ছিলেন। ভোজনের পর তিনি (সা.) যখন নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে চাইলেন সকলেই উঠে চলে যেতে গেল, কেউই তাঁর কথা শুনল না। হযরত আলি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে আরও একটি দাওয়াতের বন্দোবস্ত করলেন। তিনি (সা.) ভোজনের পূর্বে আত্মীয়দের সম্বোধন করে বললেন-

হে আব্দুল মুতালেবের বংশধরগণ! দেখ আমি তোমাদের নিকট এমন বিষয় নিয়ে এসেছি যার থেকে উত্তম আমাদের গোত্রের নিকট কেউ কখনো নিয়ে আসে নি। আমি তোমাদেরকে খোদার দিকে আহ্বান করছি। যদি তোমরা আমার কথা শোন তবে ইহকাল ও পরকালের সর্বোত্তম নিয়ামতরাজির উত্তরাধিকারী হবে। বল তোমাদের মধ্যে থেকে কে আমার সাহায্যকারী হবে? সকলেই নীরব ছিল, পুরো বৈঠকে নিস্তব্ধতা ছেয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই এক কোণ থেকে একজন তের বছরের শীর্ণকায় বালক উঠে দাঁড়াল আর অশ্রুসিক্ত চোখে বলে উঠল, " যদিও আমি সব থেকে দুর্বল এবং সব থেকে ছোট, কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ দিব"

এটি ছিলেন হযরত আলি (রা.)। হযরত রসূলে করীম (সা.) হযরত আলির এই কথা শুনে নিজের আত্মীয়-স্বজনদের দিকে চেয়ে বললেন, " যদি তোমরা জান তবে নিজেদের ছেলেটির কথা শোন এবং এবং তাকে স্বীকার কর।"

উপস্থিত আত্মীয়গণ এই দৃশ্য দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে সমস্বরে উচ্চহাসি হেসে ওঠে। আবু লাহাব তার বড় ভাইকে বলল- " এখন মহম্মদ তোমাকেছেলের আনুগত্য করার আদেশ দিচ্ছে।" এর পর এরা ইসলাম এবং মহম্মদ (সা.)-এর দুর্বলতাকে উপহাস করতে করতে বেরিয়ে গেল।

(তাবারী, সীরাত খাতামান্নাবী, পৃষ্ঠা: ১৬৭-১৬৯)

মক্কার দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরা মনে করল যে, কোন কোন ভাবে এই নতুন ধর্মের পথ আটকাতে হবে। তারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে থাকল। কিন্তু মক্কার কিছু সৎ প্রকৃতির মানুষ এই নতুন ধর্ম সম্পর্কে জানতে মহম্মদ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতে লাগলেন। তাঁর কাছে লোকদের আসতে দেখে বাধাদানকারীরা বিভিন্নভাবে তাঁকে নির্যাতন করতে আরম্ভ করল। তাঁর কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়ার কারণে তিনি (সা.) তবলীগ এবং নতুন মুসলমানদের তরবীয়তের জন্য একটি ঘরকে কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই পবিত্র ঘরটি ছিল একজন সাহাবী হযরত আরকম বিন আবি আরকম (রা.)-এর। এই ঘরটিকে 'দারে আরকম' বল হত। পরবর্তীকালে সেটিকে দারুস সালাম বলা হত। দারে আরকম সাফা পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে ৩৫ থেকে ৪০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত ছিল। এই গৃহটিতে পাথরের দুটি কক্ষ ছিল। এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম পাঠশালা, প্রথম প্রচারকেন্দ্র এবং প্রথম ইবাদতগাহ।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করল মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের মিডল্যান্ডসের সদস্যবৃন্দ

গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১, মিডসল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য

গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১, যুক্তরাজ্যের মিড্‌ল্যান্ডসের (মধ্যাঞ্চল) মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গসংগঠন) সদস্যদের মধ্য থেকে ১৬ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছাত্রদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে নিজ কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ৬০ জন ছাত্র বার্মিংহামের দারুল বারাকাত মসজিদ থেকে এ সভায় যোগদান করেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়ে কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ ধর্ম ও সমসাময়িক সমস্যাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসকে বেশকিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পান।

ছাত্রদের একজন হুযূর আকদাসকে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য হিসেবে তাঁর স্মরণীয় একটি ঘটনা বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "খোদ্দামুল আহমদীয়ায় কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে স্মরণীয়। যখন তুমি বৃদ্ধ হবে, তুমি তোমার তরুণ বয়সের প্রতিটি মুহূর্তকে স্মরণ করতে শুরু করবে। আমার স্মরণ আছে! যখন আমরা ইজতেমার আয়োজন করতাম, তা হত খোলা আকাশের নিচে এবং আমরা আমাদের নিজেদের তাঁবু নির্মাণ করতাম। সেগুলো এমন যথাযথভাবে প্রস্তুত তাঁবু হত না, যেমনটি আজকাল তোমরা এখানে ইউরোপে অথবা অন্যান্য স্থানে পেয়ে থাক; বরং এর স্থলে আমরা আমাদের বিছানার চাদর ব্যবহার করতাম। সুতরাং যখন বৃষ্টি হত, বৃষ্টির পানি তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করত; কেননা তা পানিরোধী (ওয়াটারপ্রুফ) ছিল না। আর তাই, সেই দিনগুলো আমাদের জন্য স্মরণীয় এবং আমরা সেই ক্যাম্পিংকে উপভোগ করতাম।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন: "এটি ছিল কেবল খোলা মাঠে কাজ চালানোর মত একটি ব্যবস্থা। (রাবওয়ায়) এমনকি ইজতেমার মূল মার্কিটিও (বড় তাঁবু) এখানকার মত পানিরোধী হত না। যদি বৃষ্টি হত, তাহলে ভাল ভেজাই ভিজতে হত! অতএব এভাবেই আমরা আমাদের দিনগুলোকে উপভোগ করতাম। ইজতেমাস্থলেই খাবার রান্না হত, আর আমরা আমাদের বালতিতে করে আমাদের খাবার সংগ্রহ করতাম। ১০ জন করে এক-একটি দল এক-একটি তাঁবুতে অবস্থান করত। এমনই ছিল সেই দিনগুলো যা আমার কাছে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।"

প্রশ্নকারীদের একজন উল্লেখ করেন যে, হুযূর আকদাস সৈয়দ তালে আহমদের স্মৃতিচারণ করে যে জুমুআর খুতবা দিয়েছেন তা তাদেরকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছে; আর তিনি প্রশ্ন করেন যে, কীভাবে তার পক্ষেও সৈয়দ তালে আহমদের মত হয়ে হুযূর আকদাসের প্রিয়পাত্র হওয়া সম্ভব।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা কর। আর যদি তুমি আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জনর চেষ্টা করতে থাক, তাহলে তুমিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে- যাদেরকে খলীফাতুল মসীহ্ ভালবাসেন। এটি অর্জনের জন্য, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.)-কে বলেছেন, তিনি যেন মানুষকে বলে দেন যে, 'বল! যদি তুমি আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর: তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন।' এখানে 'আমার অনুসরণ কর' এর অর্থ হল মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করা। অতএব তোমার জানার চেষ্টা করা উচিত যে, মহানবী (সা.) কী বলেছেন আর তার কাজকর্ম কেমন ছিল, তিনি কোন্ বিষয়গুলোর অনুশীলন করতেন, আর কী কী আদেশ দিয়ে গেছেন, আর পবিত্র কুরআন একজন প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য কী কী বলে। অতএব যখন তুমি আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করবে, তখন তোমাকে খলীফাতুল মসীহ্ ভালবাসবেন, এমনকি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকলে তোমাকে ভালবাসবে। সুতরাং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণের চেষ্টা কর এবং আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা কর।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, পাকিস্তান দেশটিতে কোনদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা; কেননা এর জনগণ আহমদীদেরকে নৃশংসভাবে নিপীড়ন করে চলেছে। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "যদি পাকিস্তানী উলামা বা তথাকথিত মোল্লারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না করে, তাহলে পাকিস্তানে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না; যদি না তারা ভাল আচরণ করে, উত্তম নৈতিকতার অনুশীলন করে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে মানবিক আচরণের জন্য সচেষ্ট হয়। যদি তারা অমানবিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে, পাকিস্তানে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আমরা ১৯৫৩ সাল থেকে এটা দেখে আসছি, যখন আহমদীদের বিরুদ্ধে অনেক হৈ চৈ এবং আন্দোলন ছিল। ১৯৫৩ সালে আহমদীদেরকে শহীদ করা হয়েছিল। কিন্তু একইসাথে পাকিস্তানী আহমদীদের পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে তাদের মর্যাদা ধারণ করার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু এখন ১৯৭০ এর দশকের সংবিধান সংশোধনীর পর এবং জিয়াউল হকের অধিকতর সংশোধনীর পর, আহমদীদেরকে এমনকি নিজেদের সন্তানদের নাম মুসলমানদের মত রাখার ওপর বাধা দেওয়া হয়েছে এবং এ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। আহমদীরা 'বিসমিল্লাহ্' বলতে পারেন না, আর 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলতে পারেন না। আর এরপর তারা আহমদীদের বিরুদ্ধে আইনকে আরও জোরদার করেছে।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন: "যদি আপনি পাকিস্তানের ইতিহাসের দিকে তাকান, যখন থেকে (আহমদীদের ওপর) নিপীড়ন শুরু হয়েছে, তখন থেকে দেশে কোন শান্তি নেই। যখনই কোন রাজনৈতিক বা সামরিক সরকার আসে, তারা ভয়ে কাঁপতে থাকে আর (দেশের) নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে না। নিজেদের নাগরিকদের ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। মোল্লারা সবকিছু নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছে। যতদিন তারা অনুতপ্ত না হবে, আমার মনে হয় না পাকিস্তানে শান্তি

প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আসবে।"

ঈদুল আযহিয়া উপলক্ষে কুরবানীর পশু জবাই করা প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন করা হয়। ছাত্রটির প্রশ্ন ছিল, কোন পশু জবাই করার পরিবর্তে কেউ কী দরিদ্রকে অর্থ অনুদান দিতে পারেন?

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন: "আমাদের কি আমাদের নিজস্ব শরীয়ত ও সুন্নাহ্‌র প্রচলন করা উচিত, নাকি মহানবী (সা.) যা করতেন তার অনুসরণ করা উচিত? তিনি সাধারণত ভেড়া কুরবানী করতেন। বিশ্বে এমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ রয়েছেন, যাদের মাংস খাওয়ার সুযোগ হয় না। এখানে ইউরোপে তোমাদের পক্ষে এটি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যারা এখানে ইউরোপে অথবা পশ্চিমা দেশগুলোতে বা ধনী দেশগুলোতে বাস করেন, তারা তাদের (ঈদের) পশু কুরবানী সেসব এলাকায় করতে পারেন যেখানে দরিদ্র বেশি।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন: "একবার যখন আমি একজনকে আফ্রিকার কোন এক গ্রামে কিছু ছাগল কুরবানী করার জন্য বলি, তখন আমি পরবর্তীতে যারা মাংস পেয়েছিল তাদের কাছে এই প্রতিক্রিয়া পাই যে, 'আমরা তিন বা চার বছর পরে মাংস দেখলাম এবং মাংস খেলাম!' যদি তোমার যথেষ্ট অর্থ থাকে, তাহলে ঈদুল আযহিয়ার কুরবানীর পরও তুমি গরীবদেরকে অর্থ সদকা করতে পার। কিন্তু ঈদের জন্য, তোমাকে মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করতে হবে।" একজন ছাত্র উল্লেখ করেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাকে যুগের প্রকৃত ইমাম হিসেবে গ্রহণ করবে; আর তাই, হুযূর আকদাসের কাছে তার প্রশ্ন, সেই সময় কখন আসার সম্ভাবনা আছে?

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন: "মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, মূসায়ী মসীহ্‌কে (বৃহৎ পরিসরে) গ্রহণ করতে প্রায় ৩০০ বছর বা ততোধিক সময় লেগেছিল যখন রোম-সম্রাট খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, তোমরা দেখবে যে, ৩০০ বছর অতিবাহিত হবে না, এর পূর্বে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে সত্যিকার ইসলামরূপে গ্রহণ করবে।" ভবিষ্যদ্বাণীটির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "কিন্তু এসব কিছু আমাদের আমল এবং কর্মের ওপর নির্ভরশীল; আমরা আমাদের আমল ও কর্মে সঠিক পথে আছি কিনা; আমরা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুসরণ করছি কিনা; আমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছি কিনা; যদি আমরা প্রকৃত মুসলমান হয়ে যাই, এটি সেই সময়ের পূর্বেই সংঘটিত হতে পারে। অতএব তুমি এর জন্য কী করছ? নিজের দিকে দৃষ্টি দাও। আমাদের

নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং দেখা উচিত যে, আমরা সারা পৃথিবীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার বিষয়ে কী করছি। যদি আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে আমাদের আমল ও কর্ম যথাযথ মানের হয় এবং মানবজাতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালিত হয়, তাহলে সেই সময়ের পূর্বেই আমরা এ লক্ষ্য অর্জন করব।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জাপান সফর

হুযুর আনোয়ার-এর সঙ্গে মজলিসে আমেলার মিটিং।

হুযুর আনোয়ার (আই.) মজলিসে আমেলার কায়েদদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, সমস্ত কায়েদদের দাড়ি রাখা উচিত। যৌবন বিনা দাড়িতে কাটার ছিল তা কেটে গেছে। এখন দাড়ি রাখা উচিত।

কায়েদে উমুমী নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, 'আমাদের দুটি মজলিস রয়েছে আর আনসারদের সংখ্যা ৪৪জন। ২৬ জন আনসার নাগোয়ো শহরে আর ১৮জন টোকিও শহরে। সদর আনসারুল্লাহ্ হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, দুটি মজলিসের যাঈম সহযোগিতা করে আর তাদের থেকে রিপোর্ট পাই।

কায়েদ তালিমকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, সারা বছর আনসারদের কি কর্মসূচি রয়েছে। কায়েদ তালিম জানান, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর পুস্তক 'নিশানে আসমানী' অধ্যায়নের জন্য রাখা হয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন- সর্বপ্রথম নিজেদের ন্যাশনাল আমেলাদেরকে পড়তে দিন। এরপর দুটি মজলিসে আমেলাকে পড়তে দিন এবং ক্রমে সমস্ত আনসারদের পড়তে দিন।

কায়েদ তালিম বলেন: আমরা নিজেদের মাসিক ইজলাসগুলির জন্য ঠিক করেছি সেখানে এই বইটি পড়া হবে। হুযুর আনোয়ার বলেন, 'মাসিক বৈঠকে এক-দুই পৃষ্ঠা পড়ে নিবেন। সারা বছরে ১২-১৫ পৃষ্ঠা পড়তে পারবেন। এভাবে বই পড়ে শেষ হবে না। এর জন্য নিয়মিত অধ্যায়ন করার কর্মসূচি রাখুন।

কায়েদ তবলীগকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, তবলীগের জন্য কি লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন- তবলীগের জন্য জরুরী হল মানুষের প্রকৃতি পর্যবেক্ষন করা যে কোন সীমা পর্যন্ত সে খোদাকে বিশ্বাস করে। এখানে কিছুটা খোদার ধারণা রয়েছে আর এদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর যুগেও ইসলামের প্রতি মানুষের মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। পরে তা সেই মনোযোগ সরে যায়। এরপর পুনরায় সৃষ্টি হয়ে পরে আবার সরে যায়। এভাবে একের পর এক যুগ আসে। এখন পুনরায় এদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে জিঘাঙ্সা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই তাদের প্রকৃতি অনুসারে লিটেরেচার তৈরী করুন আর তাদের মাঝে তবলীগের কর্মসূচি তৈরী করুন।

কায়েদ তবরীয়তকে হুযুর আনোয়ার (আই.) নির্দেশ দিয়ে বলেন- আনসারদেরকে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যে তারা যেন নিজ সন্তানসন্ততিদের তত্ত্বাবধান করেন, ছেলেয়েরা নিয়মিত নামায পড়ে,কুরআন করীমের তেলাওয়াত করে, ফজরের নামাযে নিয়মিত আসে। অনেক সময় যথাসময়ে পড়া হয় না। তাই যখনই ঘুম ভাঙে সেই সময়ই যেন পড়ে নেয়। আর সকলে দোয়ার প্রতি যেন বেশি করে মনোযোগী হয়। নিজেদের সন্তানদের জন্য দোয়া করুন। পেশীশক্তি দিয়ে কাজ হয় না। যা হবে তা দোয়ার মাধ্যমেই হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খুদ্দামরা যখন আনসারে উপনীত হয়, তখন তাদেরকে ঠিক সেই রকম ফূর্তিসহকারে কাজ করা উচিত যেভাবে খুদ্দামে থাকতে তারা করে এসেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেছিলেন, 'যখন খুদ্দাম থাকে তখন অত্যন্ত তৎপর থাকে, আর ৪০ পেরিয়ে আনসারে উপনীত হতেই শিথিল হয়ে যায়। লক্ষ্য করে দেখুন এমনটি কেন হয়? হুযুর আনোয়ার বলেন, জামাত নিজের কর্মসূচি তৈরী করবে আর আনসার সংগঠন নিজেদের পৃথক কর্মসূচি তৈরী করবে। সব সময় তৎপর থাকুন আর নিজেদের সুসংঘবদ্ধ করুন।

কায়েদ ইসারকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, এই বছর কি কি কাজ হয়েছে? কায়েদ সাহেব উত্তরে বলেন, এখানে নাগোয়ায় মসজিদে দেড় মাস কাজ করেছি এবং সাফাই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছি। অনুরূপভাবে টোকিওতেও সাফাই অভিযান পরিচালনা করেছি এবং স্থানীয় স্তরেও আমরাও সহযোগিতা করে থাকি।

দ্বিতীয় সারির খুদ্দামদের নায়েব সদরের কাছে হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, আনসারদের জন্য সাইকেল যাত্রা কর্মসূচি তৈরী করেছেন কি না? নায়েব সদর সাহেব বলেন, 'আমরা পদযাত্রা করার কর্মসূচি বানিয়েছিলাম যাতে একশ শতাংশ আনসার অংশগ্রহণ করেছিল। কিছু আনসার পাঁচ কিমি যাত্রা করেছে আবার কেউ সাত কিমি। আমরা তাহাজ্জুদের নামাযের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলাম। আর একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়ে সেখান থেকে পদযাত্রা শুরু করেছিলাম।

৯ই নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে জামাত আহমদীয়া জাপান Mielparque হোটেলে হুযুর আনোয়ারের সম্মানে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

আজকের এই অনুষ্ঠানে ১১৭ জন অতিথি অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি নেতা, কংগ্রেস ম্যান, নাগোয়া শহরের মেয়র, দশটি প্রদেশের সাংসদ, শান্তোইযম এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিবর্গ, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ১৪জন প্রফেসর, ১২ জন উকিল, ডাক্তার এবং বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এবং বিভাগের প্রধানরা।

একজন খৃষ্টান পাদ্রী এবং জাপানের দ্বিতীয় সব থেকে বেশি জনপ্রিয় আসাহির প্রতিনিধি তথা সাংবাদিক সাতো সাহেবও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অতিথিদের ভাষণ-

১। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা Mr Yoshiaki Shouji । তাঁর এলাকা ২০১১ সালের ভূমিকম্প ও সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেখান থেকে ৯০০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের ভাষণে বলেন-

খলীফাতুল মসীহকে জাপান আগমণের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আর ২০১১ সালের ১১ ই মাচে হওয়া ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং সুনামির পর জামাত আহমদীয়া জাপান যে সব সেবামূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করেছে, আমি তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে এখানে উপস্থিত হয়েছি।

জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের আনন্দে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে আমি জামাত আহমদীয়ার ইমামের আগমণে নিজের আনন্দ ও ঐক্যতান ব্যক্ত করতে উপস্থিত হয়েছি।

ভূমিকম্প এবং সুনামির অব্যবহিত পরেই, পনেরো মিনিট অতিবাহিত হতে না হতেই, জামাত আহমদীয়া ভূমিকম্প প্রভাবিত এলাকায় যাওয়ার জন্য মনঃস্থির করে নেয়। পরের দিন থেকেই সিনদাই শহর থেকে নিজেদের সেবামূলক কাজ আরম্ভ করে জামাতের সদস্যরা আমাদের কাছে পোঁছে যান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু সকলের থেকে আলাদা ছিল হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর স্বেচ্ছাসেবীরা। যাদের নিষ্ঠা এবং বন্ধুসুলভ সম্পর্ক আমাদের মন কেড়ে নিয়েছে।

এরপর কোবে ইন্টারন্যাশনাল চার্চের পাদ্রী এবং নেতা মি. Mr Yoshio Lwamuraনিজের বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও তিনি একটি এন.জি.ও-এর চেয়ারম্যান। জামাতে আহমদীয়ার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন- 'আমরা জামাতে আহমদীয়ার ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেবকে জাপানে স্বাগত জানাই। তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য এবং মানবতার জন্য তাঁর পথপ্রদর্শন লাভ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

১৯৯৫ সালের জাপানে হওয়া ভূমিকম্পের বিষয়ে অনেক জাপানীও ভুলে গেছে। কিন্তু জামাত আহমদীয়ার সেবামূলক কার্যকলাপগুলিকে এখনও স্মরণ করা হয়।অনুরূপভাবে ২০১১ সালের ভূমিকম্প এবং সুনামির পর জামাতের সেবা ভুলে যাওয়ার মত নয়। সেপ্টেম্বর মাসে জাপানের মুবাল্লিগ আনিস আহমদ নাদিম সাহেব শান্তোইযম, বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভূমিকম্পে ও সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করেছেন। আর আমি মনে করি, জামাতের এই চিন্তাধারা এবং শিক্ষা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় ও সৌহার্দ্য তৈরী করার মাধ্যমে যাবতীয় বিবাদের অবসান ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জাপানে আগমণ করার জন্য আমি আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মি. আকিও নাজিমা সাহেব, হাইকোর্ট বার কাউন্সিলরের একজন সদস্য এবং বরিষ্ঠ ও খ্যাতনামা উকিল নিজের বক্তব্য পেশ করেন। তিনি জামাতের শুভাকাঙ্খী আর মসজিদ বায়তুল আহাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে সেবা দান করেছেন। তিনি বলেন: জামাত আহমদীয়া এবং জাপানের সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের। ১৯৫১ সালে সানফ্রান্সিসকো শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জামাতের একজন নিষ্ঠাবান সদস্য স্যর চৌধরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের ভূমিকা এবং তাঁর এই বক্তব্য 'ভবিষ্যতে জাপান পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্দরর জন্য নিজের ভূমিকা পালন করবে আর জাপানের সঙ্গে ন্যায়বিচারপূর্ণ চুক্তি সময়ের প্রয়োজন।

তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়ার এই অনুগ্রহটি সব সময় স্মরণ রাখার মত। অনুরূপভাবে ২০১১ সালের ভূমিকম্প এবং সুনামির পর জামাতের সেবামূলক কার্যকলাপ এবং উদ্ধারকার্য আমরা কখনও ভুলব না। মানবতার জন্য জামাতের সেবা অতুলনীয়।

হযরত ইমাম জামাত আহমদীয়ার শিক্ষামালার উপর আমল করে 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' বাণীকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন এবং জামাত আহমদীয়া জাপানের উন্নতির জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করি।

এরপর কুডো শওযো সাহেব, যিনি একজন সেনেটর সদস্য, তিনি নিজের বক্তব্যে বলেন: এই অসাধারণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে জামাত আহমদীয়ার ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেবকে আন্তরিকভাবে অভিবাদন জানাই। জামাত আহমদীয়ার শান্তি এবং মানবতার জন্য ভূমিকা এবং জাপানে ভূমিকম্পের উপর সেবামূলক কার্যকলাপের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এরপর আইচি প্রদেশের গভর্নরের বার্তা পাঠ করে শোনান উমর আহমদ ডার সাহেব। আইচি প্রদেশের গভর্নর মি. ওমুরা সাহেব লেখেন- জামাত আহমদীয়া জাপানের সর্বোচ্চ নেতা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেবকে জাপানে আসার জন্য আন্তরিকভাবে অভিবাদ জ্ঞাপন করছি। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির কারণে আপনাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে না পেরে আমি দুঃখিত। আমি জানতে পেরেছি যে, জামাত আহমদীয়া জাপানীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রচেষ্টা করে চলেছে। পূর্ব জাপানে হওয়া ভূমিকম্প এবং সুনামির ঠিক পরেই জামাত আহমদীয়া যেভাবে সেবার কাজে এগিয়ে এসেছে, সে কথা স্বীকার না করে পারি না। ভবিষ্যতেও আমাদেরকে একসঙ্গে মিলে সমাজ গঠন এবং সমাজের সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে হবে।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সাম্মানিক স্মারক প্রদান করেন।

Akio Najima: তিনি নাগোয়া হাইকোর্টের পদাধিকারী এবং উকিল। তিনি মসজিদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য জন্য বিনাপারিশ্রমিকে কাজ করেছেন এবং আনুমানিক কুড়ি হাজার ডলারের কাজ অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে করেছেন। জামাত আহমদীয়া জাপানের পক্ষ থেকে তাঁর সেবার স্বীকৃতি হিসেবে সাম্মানিক স্মারক প্রদান করা হয়েছে।

2-Mr. Yoshiaki Shouji: তিনি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এবং স্থানীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধি। ভূমিকম্প এবং সুনামির পর ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য স্থাপিত শিবিরের তত্ত্বধায়ক ছিলেন। হুযুরের আগমণের সংবাদ শুনে তিনি হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে প্রায় এক হাজার কিমি পথ পাড়ি দিয়ে নিজে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

যখন সুনামি আসে তখ তিনি সাইকেলে করে প্রতিটি বাড়ি গিয়ে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার আহ্বান করছিলেন। এমনকি সুনামির ঢেউ তাঁর পিছনে কয়েক ফুট দূরে দেখা যাচ্ছিল। তিনি শেষ মুহূর্তে কোনও রকমে প্রাণে রক্ষা পান।

ভূমিকম্প এবং সুনামিতে প্রভাবিতদের প্রতি নিজের একাত্মতার কারণে জামাত আহমদীয়া জাপানের পক্ষ থেকে তাঁকে স্মারক প্রদান করা হয়েছে।

3-Mohammad Aves kobayashi: আমাদের প্রথম জাপানী আহমদী। তাঁর বয়স আসি বছরের উর্দ্ধে। তবুও তিনি অনেক পরিশ্রম করে কুরআন করীমের অনুবাদ রিভিউ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে জাপানীদের মাঝে আহমদী জাপানী মুসলমানের পরিচয়ও উপযেগী সাব্যস্ত হয়েছে। তাঁকে এই কাজ পূর্ণ করার জন্য তাঁর সেবার স্বীকৃতি হিসেবে স্মারক প্রদান করা হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

হুযুর আনোয়ার বলেন: সর্ব প্রথম আজকের এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সমস্ত অতিথিদেরকে আমন্ত্রন গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। জাপানে জামাত আহমদীয়ার সদস্য সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।আমাদের জামাতের সদস্যদের মধ্যে যারা এখানে রয়েছেন তাদের অধিকাংশই পাকিস্তান থেকে আসা কিম্বা তারা অন্য কোনও দেশ থেকে এখানে এসেছেন। তা সত্ত্বেও আপনারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন আর এটি আপনাদের উদারমনস্কতা এবং কোমলতা এবং ভালবাসার প্রমাণ। সারা বিশ্বে যখন ইসলাম সম্পর্কে ভীতি ও অবিশ্বাসের পরিরবেশ বিরাজ করছে, তখন মুসলমানদের একটি সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আয়োজিত এমন অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার আপনাদের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। এই কথাগুলি মাথায় রেখে আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই সমাজে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার বা সৌজন্যবশত অপরের মূল্যকে সম্মান দেওয়া অতি সাধারণ বিষয়। তথাপি যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মেনে চলে তারা কেবল গতানুগতিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে না, বরং তারা এই জন্য করে যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.) আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে খোদা তা'লার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। অতএব একজন সত্যিকার মুসলমানেনর জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা তার ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা এতটাই পূর্ণাঙ্গীন এবং অনিন্দ্য সুন্দর যে প্রতিটি ক্ষেত্রে তা মোমেনদেরকে সেই আলোকিত পথের দিশা দেখায়, যার ভিত্তি ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ। তথাপি পরিতাপের বিষয় হল, মুসলমানদের অধিকাংশই এই শিক্ষামালা ভুলে বসে ভুল পথে চালিত হচ্ছে। তথাকথিত ধর্মীয় আলেমরা তাদের পথপ্রদর্শক, যারা কেবল নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে এদেরকে বিপথে চালিত করছে। এই সব তথাকথিত উলেমা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দেওয়া শিক্ষার সঙ্গে ইসলামের প্রকৃত ও অসাধারণ শিক্ষার কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাসত্ত্বেও তাদের কার্যকলাপের পক্ষে যুক্তি খাড়া করতে ইসলামকে ব্যবহার করে চলে। অথচ ইসলামের অর্থই হল শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ব। আরবীর যে ধাতু থেকে 'ইসলাম' উদ্গত হয়েছে, তার অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, ভালবাসা এবং সহানুভূতির প্রসার। আর এই শিক্ষাই হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা এই গুণাবলী কেবল মুসলমানদেরকে অবলম্বন করার আদেশ করেন নি, বরং এই শান্তি, ভালবাসার শিক্ষা পৃথিবীতে প্রসারের আদেশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা ভালবাসার এই শিক্ষার উপর এতটাই জোর দিয়েছেন যে, তাঁর আদেশ, একজন মুসলমানের উচিত তার নিজের কঠোর শত্রুর বিরুদ্ধেও অন্যায় না করা।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন- 'হে

(সূরা মায়েদা, আয়াত: ৯)

হুযুর আনোয়ার বলেন: ন্যায়-নীতি ও সুবিচারের উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমের অপর এক আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে সাক্ষী দেয়,যদিও তা দিতে হয় নিজের বিরুদ্ধে, নিজের পিতামাতার বিরুদ্ধে বা প্রিয়জনের বিরুদ্ধে।অতএব ন্যায়ের এই উচ্চ মান যা কুরআন করীম শিক্ষা দিয়েছে এবং যা সকল প্রকার অন্যায় নির্মূল করার ভিত্তি তৈরী করে। আর এটিই ইসলামের উদ্দেশ্য। সমস্ত কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা ভালবাসা এবং সমন্বয়ের শিক্ষা দিয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ আমরা পৃথিবীতে দেখছি, তথাকথিত কিছু মুসলমান ভয়াবহ এবং নৃশংস অপরাধে লিপ্ত রয়েছে। আত্মঘাতী বিস্ফোরণ এবং সন্ত্রাসী আক্রমণের মাধ্যমে নির্বিচারে শিশু ও মহিলাদের হত্যা করছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল, এরা এই সব জঘন্য কাজগুলি করছে ইসলামের নামে করছে। নিঃসন্দেহে তারা যা কিছু করছে তা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। বস্তুত কুরআন করীম ঘোষণা দেয়, একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানবতাকে হত্যা করার নামান্তর। অতএব, পরিস্থিতি যাইহোক না কেন, একজন মুসলমান কখনই এই ধরণের অত্যাচার করার অধিকার পেতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আরও একটি অপরাধ ইসলাম যাকে হত্যার চায়তেও গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে সেটি হল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। এর কারণ হল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা যে পরিমাণ ক্ষতি করে তার অপরিমেয়। অরাজকতা খুব দ্রুত উগ্র রূপ ধারণ করে যা সমাজের যে কোনও শ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্যে পরিণত করে বড় বড় লড়াই বাধিয়ে দিতে পারে। সেটা হতে পারে একটি পরিবার, একটি শহর বা মফসসল বা এর থেকে বেশি বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে। এমন সব বিবাদের পরিণাম হিসেবে আসতে পারে দুই বিবাদমান পক্ষের মধ্যে অন্যায় অত্যাচার এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দৃশ্য। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, 'যারা বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ছড়ায়, তারা এমন অপরাধে দুষ্ট যার ভয়াবহতা একটি অন্যায় হত্যার অধিক। অতএব,

ইসলাম এই অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার উপরই জামাত আহমদীয়া প্রতিবন্ধ রয়েছে আর সমগ্র জগতে এই শিক্ষার প্রসারই করে চলেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের মনে আবার এমন ধারণা উদ্রেক না হয় যে, আমাদের শিক্ষা ইসলামের নতুন কোনও রূপ কিম্বা ইসলামের থেকে ভিন্ন কোনও শিক্ষা। বরং প্রকৃতপক্ষে এটি সেই শিক্ষা যা আঁ হযরত (সা.) স্বয়ং আনয়ন করেছেন। শেষ যুগের সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক যুগ আসবে যখন মুসলমান জাতি অন্ধকারে ডুবে যাবে আর কুরআনের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তিনি (সা.) বলেছেন, সেই যুগে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হিদায়াত প্রাপ্ত হবেন এবং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা প্রদান করবেন এবং পৃথিবীতে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করবেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বাস করে, আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে এই যুগের আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য এব পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পোঁছে দেওয়ার জন্য আবির্ভূত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। অতএব, এই উদ্দেশ্য পুরণের জনন্যই আমরা আহমদীরা মসজিদ নির্মাণ করছি, মিশন হাউস নির্মাণ করছি।আর যখন বা যেখানে পোঁছতে পারি সেকানে এই বার্তার পোঁছে দিচ্ছি। আমাদের মসজিদগুলি হল শান্তির প্রতীক এবং আলোর কিরণ যা তার চতুর্পার্শ্বকে আলোকিত রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, আমাদের মসজিদগুলিতে হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ প্রদান করা হয়। তেমনি অপরদিকে মানবতা তথা অভাবীদের সেবার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। অতএব, আমাদের মসজিদগুলি মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তৈরী করা হয় না, বরং এর বিপরীতে সমস্ত মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এবং তাদেরকে ভালবাসার জন্য তৈরী করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা ইসলামের প্রারম্ভিক ইতিহাসের উপর দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব যে, আঁ হযরত (সা.) এর নবুয়ত্যের ত্রয়োদশ তম বছর পর্যন্ত আঁ হযরত (সা.)এর অনুসারীরা মক্কার কাফেরদের কাছে নির্যাতিত হয়ে এসেছে। এই অনবরত অত্যাচারের কারণে অবশেষে রসুল করীম (সা.) মদীনা হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁকে এবং তাঁর সাহাবাদেরকে বিতাড়িত করার পরও শান্তিতে থাকতে দেয় নি তারা। আঠারো মাস পরই মক্কার কাফেররা ইসলামকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে এবং আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সাহাবাদের হত্যা করার চেষ্টায় যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে মক্কার অপশক্তিকে প্রত্যুত্তর দিতে আল্লাহ্ তা'লা রসুল করীম (সা.)কে মুসলমান সেনাদল গঠনের আদেশ দেন। তথাপি এই আদেশের মধ্যেও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার এমন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল যার তুলনা নেই। আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, যুদ্ধের অনুমতি এই কারণে দেওয়া হয়েছে যে, যারা মুসলমানদেরকে হত্যা করতে চাইত তারা কেবল ইসলামের বিরুদ্ধেই নয়,বরং সমস্ত ধর্মের বিরুদ্ধে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- যদি মুসলমানেরা তাদের আক্রমণের জবাব না দিত, তাহলে না থাকত ইহুদীদের উপাসনাগার, না থাকত কোনও মন্দির বা অন্য কোনও উপাসনাগার। তাই এই প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি সমস্ত ধর্মের মানুষের নিরাপত্তার একটি মাধ্যম ছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাই জামাত আহমদীয়া পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে যখনই কোনও মসজিদ নির্মাণ করে তখন তার পেছনে আমাদের এই বিশ্বাস কাজ করে যে, প্রত্যেক ধর্মের উপাসনাগার রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এবং এক খোদার উপাসনার জন্য আমাদের নির্মিত মসজিদগুলির দরজা সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্য সব সময় খোলা রয়েছে। নিঃসন্দেহে আমাদের মসজিদগুলি এবং আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে শান্তি এবং ভালবাসায় পরিপূর্ণ। আমরা বিপদগ্রস্ত এবং কষ্টে নিপতিত সকলের সাহায্য করতে চাই আর তাদের সেবা করতে চাই। আমরা তাদের কষ্ট দূর করতে চাই কেননা এটাই প্রকৃত ইসলাম।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমানে পৃথিবীর মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে একে অপরকে দোষারোপ করছে। আর পৃথিবীতে বিরাজমান অস্থিরতা এবং শান্তি সংকট নিয়ে একে উপরের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। আর রাজনৈতিক স্তরেও কিছু দেশ অন্য দেশকে এমনটি করার দোষে অভিযুক্ত হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কিছু মুসলমান দেশ পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে দুর্দশার শিকার হয়েছে। সেই সব দেশের নেতৃবর্গ এবং জনসাধারণ একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাদের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হচ্ছে, অথচ যুগের প্রয়োজন হল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং একে অপরের বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয় দোষারোপ এবং সমালোচনা বন্ধ করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তথাকথিত মুষ্টিমেয় মুসলমানদের অন্যায় অত্যাচার দেখে নিশ্চয় আপনাদের অধিকাংশ ইসলাম সম্পর্কে সংরক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করেন বা ইসলাম সম্পর্কে ভীত হবেন এবং ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের ধর্ম মনে করবেন। কিন্তু ইসলামের বাস্তবতা সেটাই যা আমি আপনাদের সামনে বর্ণনা করেছি, সেটির বিপরীতে যা সাধারণত উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। ইসলাম উগ্রতা ও কঠোরতা ধর্ম নয়। যদিও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুষ্টিমেয় তথাকথিত মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস জন্ম নিয়েছে। যা কিছু তারা বলে এবং করে তা একেবারে অনুচিত। এরপরও যদি বলা হয় যে ইসলাম জুলুম ও বর্বতার ধম তবে একেবারেই অন্যায় হবে। তাই যখন বলা হয় যে ইসলাম সন্ত্রাসবাদ এবং উগ্রতার ধর্ম, তখন বিশেষ করে আহমদীরা এবং সেই সব মুসলমানেরা ভীষণ কষ্ট পায় যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মেনে চলে। অতএব, ইসলামকে দোষারোপ করা এবং অত্যাচারী ধর্মের তকমা দিয়ে নিরীহ মুসলমানদের ভাবাবেগে আঘাত করা উচিত নয়। কেননা এর সঙ্গে সত্যের কোনও যোগ নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা হিসেবে আমি বিশ্ববাসীকে অবিরতভাবে এ বিষয়ে সতর্ক করে এসেছি যে এই যুগে আমাদের প্রয়োজন হল ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রসারের পরিবর্তে ভালবাসার বাণী প্রসার করা। আমাদেরকে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। এটিই যুগের প্রয়োজনীয়তা। আমরা যদি শান্তির প্রকৃত দূত না হতে পারি তাহলে পৃথিবীতে অতর্কিত বিপদ নেমে আসতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমান যুগে ছোট ছোট দেশের কাছেও পারমাণবিক অস্ত্র ভাণ্ডার রয়েছে। আর শেষমেশ এই অস্ত্রগুলি সন্ত্রাসবাদীদের হাতে চলে যাওয়াও সম্ভব যারা এই সব অস্ত্রের ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। যেমনটি আমি বলেছি, আমি পৃথিবীকে ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করছি। অতএব আমি আপনাদের সকলের কাছে এই আবেদনই করব যে পৃথিবীতে শান্তি প্রসারের জন্য যথা সম্ভব সচেষ্ট হোন। নিজের নিজের রাজনৈতিক দলকেও বলুন যে, অন্যায় ও অত্যাচারের পথে চলার পরিবর্তে এবং একে অপরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখার পরিবর্তে আমাদেরক ভালবাসা ও সৌহার্দ্যের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। যেখানেই আমরা অন্যায় হতে দেখি তৎক্ষণাৎ তা নির্মূল করার চেষ্টা করা উচিত। জাপানি জাতি এবং জাপানের নেতারা সেই সব মানুষদের অন্তর্ভুক্ত যারা অন্যান্য জাতির তুলনায় পৃথিবীতে শান্তির প্রয়োজনীয়তা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। আপনারা পারমাণবিক বোমার ভয়াবহ প্রভাব এবং এর পরিণামে হওয়া বিপুল মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। আপনারা আধুনিক যুগের যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সব থেকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: তাই আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর সমস্ত জাতি এবং তাদের নেতাদেরকে প্রজ্ঞার সাথে কাজ করার তৌফিক দান করুন যাতে সমাজে বিরজমান অন্যায় ও বর্বরতার উপাদানগুলি তাদের জঘন্য কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা করা যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদিও প্রতিটি দেশের সরকার দাবি করছে যে তারা সব ধরণের অন্যায় অত্যাচার নির্মূল করতে চায় আর পৃথিবীকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করতে চায়, তবু আমাদের চোখের সামনে পৃথিবীতে দুটি জোট তৈরী হচ্ছে। পরস্পর বিরোধী এই দুটি জোট একে অপরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত দাবি করে চলেছে আর তাদের বিবৃতি দেওয়ার কারণে ক্রমশ তাদের মধ্যে উত্তাপের পারদ চড়ছে। ফলে বৈরিতা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অলীক প্রতিপন্ন হবে। এটাই হবে এই সব গতিবিধির সম্ভাব্য পরিণাম।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে বিবেক দান করুন। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা দূরে সরিয়ে রেখে একত্রে বসে এবং যাবতীয় অনাচার নির্মূল করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা করে যাতে আমাদের আগামী প্রজন্ম অবর্ণনীয় ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায় যা যে কোনও দেশের পক্ষ থেকে হওয়া

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 19 May, 2022 Issue No. 20

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সব শেষে আমি আবারও এখানে সময় বের করে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের অভিমত।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, এবং সিটি পার্লামেন্টের সদস্য মি. ইউশিয়াকি শউজি সাহেব বলেন: খলীফাতুল মসীহর ভাষণ ভালবাসা ও শান্তিপূর্ণ বাণী ছিল। আমরা নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি যে এই মহতি সভায় উপস্থিত থাকতে পেরেছি।

আজ আমার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট দিনগুলির মধ্যে একটি, যে দিনটিতে আমি পৃথিবীর এক অসাধারণ পবিত্র ব্যক্তিকে দেখেছি, তাঁর ভাষণ শুনেছি এবং এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, জামাত আহমদীয়ার ইমাম এবং তাঁর শিক্ষামালার মধ্যেই বিশ্ব-শান্তির রহস্য নিহিত রয়েছে।

নাগোয়া শহরের মেয়র মি. কাওয়ামুরা বলেন: হুযুর অত্যন্ত আকর্ষণীয় বক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর চিন্তাধারাগুলিও ততটাই সুন্দর আর তাঁর মত মানুষেরই নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত।

তিনি হুযুরের নিকট নিবেদন করেন যে, কি করলে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ক বজায় থাকবে। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার নিজের হাত প্রসারিত করে মেয়র সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে বলেন-'আমরা যখন বন্ধুত্বের হাত বাড়াই তখন তা টেনে নিই না।

নাগোয়া এবং লস এঞ্জেলস- এই দুই শহরকে দুই বোন বলা হয়। জামাত আহমদীয়া জাপানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পরিচিতিমূলক ফোল্ডারে লাস এঞ্জেলসের মেয়রেরও ছবি ছিল। নাগোয়ার মেয়র হুযুর আনোয়ারকে বলেন, তিনি কিছুদিনের জন্য লস এঞ্জেলস যাচ্ছেন। হুযুর বলেন, লস এঞ্জেলসের মেয়রকে আমার কথা বলবেন। তিনি আমাকে ভালভাবে চেনেন।

প্রাদেশিক সাংসদ মিসেস হিগাশি বলেন, তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন যে আজকের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। জামাত আহমদীয়ার ইমামের আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গি এবং ইসলামের সুন্দর বাণী তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

মি. আকিও নাজিমা একজন খ্যাতনামা উকিল। তিনি বলেন- জামাত আহমদীয়ার নেতাকে জাপানে স্বাগত জানাতে আমি আন্তরিকভাবে নিজের ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতার আবেগ ব্যক্ত করছি। ১৯৫১ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে হযরত চৌধরী মহম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব তাঁর অসাধারণ ভাষণের মধ্য দিয়ে এই সম্পর্কের ভিত রচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন-জাপানের প্রতি সুবিচার এবং জাপানে শান্তি প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ভবিষ্যতে জাপান বিশ্ব-শান্তি এবং রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে।' জাপানে হওয়া ভূমিকম্প এবং সুনামির পর জামাত আহমদীয়ার মানবতার সেবামূলক কাজ আমরা কখনও ভুলব না। জামাতের সদস্যদের ভূমিকা, তাঁদের প্রকৃতি এবং যেদেশে বাস করে সেদেশের প্রতি সেবামূলক মনোবৃত্তি এই জামাতকে সারা পৃথিবীতে এক বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে।

তিনি বলেন- জামাত আহমদীয়া এক আশা, শান্তি এবং ভালবাসার বাণী। আমি বিশ্বাস করি, খলীফার নেতৃত্ব এবং জামাত আহমদীয়ার ভূমিকা বিশ্ব-শান্তি এবং পৃথিবীতে ভালবাসা প্রসারের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

তিনি বলেন- আজ আমরা ইসলামের এক অনিন্দ সুন্দর রূপ অবলোকন করেছি এবং এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, পৃথিবী যদি কারো হাতো একত্রিত হতে পারে তবে সেই হাত হতে পারে জামাত আহমদীয়ার ইমামের হাত।

এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নাগোয়ার পদাধিকারী মি. নাকাশিমা মাসাতো বলেন: পৃথিবীতে মানবতার প্রতি সহমর্মিতা পোষণকারী আজও রয়েছে- আজকের ভাষণ শুনে আমার মনে এই আশার আলো সঞ্চার হয়েছে।

ইউশিও লওমুরা একজন খৃষ্টান পাদ্রী। তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: হযরত খলীফাতুল মসীহ খামিস এর অসাধারণ চিন্তাশক্তি এবং সমগ্র বিশ্বের সম্যাবলীল সমাধান খোঁজার বাসনাই এই কথার প্রমাণ যে তিনি কেবল জামাতের নেতা নন, সমগ্র জগতের প্রকৃত নেতা ও পথপ্রদর্শক।

নাগোয়ার উপকুলীয় অঞ্চল 'চাতাহানতু' থেকে আসা জাপানী নাগরিক মি. ইয়ামাযাকি হিরোইয়োকি বলেন: আজকের সুন্দর সভা এবং হুযুরের শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরীর প্রচেষ্টা বিষয় বক্তব্যটি প্রশংসনীয়। তাঁর কথা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম একটি সুন্দর ধর্ম, কিন্তু একে দুর্নাম দেওয়া হচ্ছে।

উত্তর জাপান থেকে আসা এক চিকিৎসক চিদা তাকা ইউকি সাহেব বলেন: আজকের অনুষ্ঠানে মন আনন্দে ভরে উঠেছে। হুযুরের চোখে এক বিচিত্র জ্যোতি ছিল। তাঁকে দেখে এক আকর্ষণীয় ব্যাক্তিত্বের অকিারী বলে মনে হয়। তিনি বার বার জাপানে আসুন আর উত্তরী জাপানেও যেন তিনি আসেন।

আজকের অনুষ্ঠানে হুযুর বলেছেন, মানবীয় সহানুভূতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং দূরত্ব যেন বৃদ্ধি পেতে না দেওয়া হয়। এমনটি হতে থাকলে পৃথিবী সত্যিই এক ভয়াবহ যুগে প্রবেশ করবে। হুযুরের এই কথাগুলি শুনে আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে

নাগোয়ার এক প্রিন্টিং কোম্পানির মালিক মিস্টা ভেনো হিরোশি সাহেব বলেন: আজ হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এক বিচিত্র আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিপূর্ণ বলে প্রতিভাত হচ্ছিল। মানবতার প্রতি জামাতের সেবা সত্যিকার অর্থেই জাপানী জাতির কাছে মূল্যবান। জামাত আহমদীয়া মানুষের জন্য এমন সব কাজ করে যা জাপানীরা নিজেরাও করতে পারবে না। প্রায় ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে জামাতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে।

মি, আকুটসু মায়াইউসকি সাহেব ইসলামি ওয়ার্ল্ড বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি টোকিও ইউনিভার্সিটিতে গবেষনা করেন। তিনি বলেন, আজকের এই সভা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। ইসলামের এই শিক্ষা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব এবং সহানুভূতির নিশ্চয়তাদানকারী এবং মানবীয় মূল্যবোধ রক্ষাকারী। সারা পৃথিবীতে এর প্রসার হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, যেমন কুরআন করীমের শিক্ষা হল, 'যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে সে সমগ্র মানবতাকে হত্যা করেছে। ' এই শিক্ষা অসাধারণ। পৃথিবীতে এই শিক্ষার প্রচার হওয়া দরকার।

নাগোয়ার এক প্রেস সাংবাদিক বলেন: আমি নাগোয়া সংলগ্ন সুশিমা শহরে মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের জন্য হেদায়াতের পথ খোলার সংবাদ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। যুদ্ধের বিপরীতে আহমদীয়াতের শান্তি ও সৌহার্দের শিক্ষা অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়।

একজন স্কুলের অধ্যাপক মি. উটো ইয়াসুহিরো হুযুরের ভাষণ শুনে বলেন- আমি স্থির করেছি যে হুযুরের বাণী আমার স্কুলে ছাত্রদের সামনে সবিস্তারে তুলে না ধরলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। আগে ইসলাম সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা ছিল হুযুরের ভাষণ শোনার পর তা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়েছে।

তিনি বলেন, পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম। আজ আমি এ বিষয়ে আশ্বস্ত হয়েছি যে, পৃথিবীর কোনও একজন পথপ্রদর্শনকারী তো রয়েছেন। এই বার্তা যদি পৃথিবীর কাছে না পৌঁছয় তবে পৃথিবী তৃতীয় মহা যুদ্ধের কবলে পড়বে।

ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি অফ ট্রানস্লেশন-এর ইনচার্য মি. সাসকি কেনজি বলেন: হুযুরের চেহারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় যার মধ্যে আমি আধ্যাত্মিকতা দেখতে পেয়েছি। জাপানী সমাজ ইসলাম থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। জাপানে এমন অনুষ্ঠান করা খুব ভাল পদক্ষেপ। ইসলামের শিক্ষা এত সুন্দর, আজ আমি প্রথম সে সম্পর্কে অবগত হলাম। খলীফাতুল মসীহর আজকের ভাষণ জাপানী জাতিকে ভীষণভাবে উপকৃত করবে।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir